Borikua College by Nobonita Sen

বরিকুয়া কলেজ

নবনীতা দেবসেন

সাপের মতো না, শুয়োপোকার মতো না, রেলগাড়ির মতোও না। কিসের মতো যে এই দীর্ঘ মনুষ্যরেখা, ভেবে পাচ্ছি না। নড়ছে, চলছে, জ্যান্ত। অগুন্তি জীবন্ত টুকরোর সমাহারে একটা গোটা জিনিস আকৃতি পেয়েছে। তার একটা গতি আছে, লক্ষ্য আছে, একটা সামগ্রিক প্রাণ আছে। মিছিল নয়, কিউ। শয়ে-শয়ে মানুষ ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রীট থেকে ফিফটি থার্ড পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় পুরো ব্লকটা প্রদক্ষিণ করে। পূর্বদিকে ফিফথ অ্যাভিনিউ, নিউইয়র্কের সবচেয়ে ফ্যাশনেবল রাস্তা। মাঝখানে শোভা পাচ্ছে ভক্ত পরিবৃত 'মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট।'

সকলের হাতেই টিকিট। বাঁধাধরা সময় মাফিক এক-একটা দলকে ঢুকতে দিচ্ছে। থিয়েটার এজেন্টদের কাছে তিন হপ্তা আগে থেকে কিনতে হচ্ছে এই টিকিট। বুধবার, অর্থাৎ আজকে, অবশ্য মেম্বার্স ডে। মেম্বার্স কার্ড হোলডার্স ওনলি! এ কি সোজা ব্যাপার? 'টাইম' ম্যাগাজিন বলেছে, এটা আমেরিকার কালচারাল ইভেন্ট অব দি ইয়ার নাইনটিন এইট্টি। পিকাসো রেট্রসপেকটিভ একজিবিশন। নিউইয়র্কের জনপ্রিয়তম ঘটনা। চট করে নিজের পোশাক-আশাকের দিকে এক নজর দেখে নিই। যাক শাড়ির মতো ফ্যাশনেবল পোশাক আর পৃথিবীতে নেই। তায় দক্ষিণী সিল্ক। ইচ্ছে করেই শার্ট পেন্টুলুন পরে আসিনি আজ। সেজেগুজে যেতে হবে না? এতো বড় একটা ব্যাপারে যাচ্ছি। কতো না রুচিমান মানুষের ভিড় সেখানে! কিউতে দাঁড়িয়েই অবশ্য বুঝে গেছি, সকলেই যে শিল্প-পাগল, তা নয়। অনেকেই এসেছে, হুজুগে মেতে। অনেকে আবার একদমই শিল্প বোঝে না। সেটা জানা গেল ভেতরে ঢুকে।

একটা শিল্প প্রদর্শনী নিয়ে সারা শহর উন্মত্ত হয়ে রয়েছে এ ঘটনা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ঠিক এখনই লন্ডনের টেট গ্যালারিতে চলেছে সালভাদর দালির প্রথম রেট্রসপেকটিভ প্রদর্শনী। তাতে লন্ডন তো এমন মেতে ওঠেনি? বিনা কিউতেই টিকিট কেটে দিব্যি ঢুকেছিলাম। ইশ পিকাসো বেঁচে থাকতে থাকতে কেন যে হলো না এটা? কতো আহলাদ পেতেন, যা একটি প্রচন্ড ইগো ছিল! খুবই সুখী হতেন, আনন্দে নেচে নিতেন দু-পাক!

পথে যেন মেলা বসেছে। একপাশে ঠেলা গাড়িতে কাগজে মোড়া হ্যামবার্গার হটডগ বিক্রি হচ্ছে। চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে ভাজা পেঁয়াজের। আরেক ঠেলায় নানা ধরনের সত্যি ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস। আমাদের দুর্লভ ধন 'কোকাকোলার' ছড়াছড়ি। আরেক ঠেলাওলা বেচছে আইসক্রীম। সবাই 'মুখর', কিছু না কিছু খাচ্ছে, চুষছে, চাটছে, চিবোচ্ছে, চুমুক দিচ্ছে। দিব্যি ফ্রয়েড সায়েবের মনের মতো প্রামাণ্য দৃশ্য।

আইসক্রীম-কোণ চাটতে চাটতে সামনের মহিলা তার সঙ্গিনীকে বললেন, বাপরে কী বীভৎস গরম পড়েছে এ-বছর। কাল রাত্রের নিউজ দেখলে? সঙ্গিনী বললেন, হ্যাঁ, ইশ্। সর্বনাশা গ্রীষ্ম! সাতশো লোক মারা গেছে সাউথে। এখানেও মরবে এবারে! রোদটা দেখেছো?

এমন কিছুই রোদ নয়। কালকের টিভি নিউজ আমিও দেখেছি। সাউথে সাতশো জন হীট-স্ট্রোকে মরেছেন। মানুষের মৃত্যু নিশ্চয়ই খুবই শোকাবহ ঘটনা। সাতশো মানুষ, সংখ্যাটাও কম নয়, কিন্তু কেন জানি না আমার যথেষ্ট দুঃখ হয়নি। ভারতবর্ষের মানুষ আমি, সেদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাতশো প্রাণ নষ্ট, তো ডাল-ভাত! এই মহিলাদের হাহাকার শুনেও তেমন সহানুভূতি হলো না আমার। বরং কেমন একটা রাগই চড়ে গেল

মাথায়। কিছু এমন একটা দুর্দান্ত গরম নয়। দুর্গাপুরে হামেশা একশো দশ থেকে আঠারো হচ্ছে, গয়ায় একশো কুড়ি, এখানে একশো ডিগ্রি হতে না হতে মানুষ ঝপাঝপ মরছে। সুখের শরীর সব। জল-পানি তো খাবে না, কেবল দুধ, বিয়ার, হুইস্কি, বার্বন খাবে। সবজি খাবে না, কিলো কিলো শূয়োর খাবে, মরবে না?

টাকাকড়ির অভাব নেই যাদের, তারা ঠান্ডা-গরমে মরবে! দেশটা যখন যথেষ্ট গরম, তখন তার যোগ্য ব্যবস্থা করলেই হয়? শীতের বিরুদ্ধে তো এতোরকম অস্ত্রশস্ত্র, অথচ গরমের জন্য পাখা পর্যন্ত নেই! গরম পড়লে ঠান্ডা ঠান্ডা খাবার খাবে তো? বেশি করে জল খাবে তো? নুন খাবে তো? এতো সায়েন্টিফিক লিভিং তোদের, গরমের সময় কি করতে হবে ঠাউরে উঠতে পারিস না? এমন চমৎকার মাস মিডিয়া রেডি রয়েছে– ডাক্তাররা প্রচার করে দিলেই পারে, কী কী উপায়ে গরমের সঙ্গে যুঝতে হবে। এদেশে মানুষ তো মোটে মরেই না, খুনীর হাতে, ক্যানসারে আর মোটর অ্যাকসিডেন্টে ছাড়া। এতো বড় একটা দেশে কতো কোটি মানুষ–সাতশো জন সুখী লোক না হয় আশাতীত গরমে মরেই গেছে! কী বাড়াবাড়িই-না হচ্ছে তাই নিয়ে। দূর দূর, আমাদের কাছে এটা আবার একটা নতুন ঘটনা নাকি? আমাদের দেশে অমন তো প্রত্যেক বছরে হচ্ছে। এই সেদিন কোলিয়ারিতে জলে ডুবেই মরলো সাড়ে চারশো শ্রমিক। সর্দি-গর্মিতে মরছে, শীতের দাপটে মরছে, বন্যায় ভেসে মরছে, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে। মরার আর উপায়ের অভাব কিসের? সাপে-বাঘে কেটে মরছে, ডাক্তারের অভাবে মরছে, ডাক্তারের অযত্নে মরছে, চাকরি করতে না পেরে মরছে, পণ দিতে না পেরে মরছে, পুলিশের গুলীতে মরছে, গুন্ডার বোমাতে মরছে, মনের দুঃখে মরছে। তাতে এদের তো কিছু এসে-যায় না? পৃথিবীতে সায়েব মরলেই কেবল শোকের বান ডেকে যায়, কেবল ওদেরই প্রাণের দাম আছে! তাহলে সাহেবরাই শুধু মানুষ?

চটেমটে উঠে একবার ভাবলুম, যাই, একটা কোকাকোলা খেয়ে ঠান্ডা হয়ে আসিগে। কিন্তু লাইন ছেড়ে বেরুলে আর কি ঢুকতে পারবো? ঠিক পেছনেই যিনি আছেন, তার সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

ভদ্রলোকের একমাথা ঝাঁকড়া চুল সাঁইবাবার স্টাইলে। এলোমেলো ঝাঁকড়া হয়ে আছে, মুখের চতুর্দিকে জ্যোতির্বলয়ের মতো মহিমা বিস্তার করে। এদেশে এর নাম অ্যাফ্রোস্টাইল। অতি আধুনিক, রেবেলদের হেয়ার স্টাইল, বিদ্রোহের সংকেত। দোকান থেকে খরচ করে করিয়ে আনতে হয় রীতিমতো। রোদে-পোড়া তামাটে চামড়া, মনে হচ্ছে মূলত সাদাই। পরনে ফ্যাকাসে রং-চটা লিভাইস আর কালো একটা টী-শার্ট। টী-শার্টের বুকে সাদা হরফে পিকাসোর স্বাক্ষরটি জ্বলজ্বল করছে।

বাঃ! চমৎকার তো? জামাটি দেখেই কোকাকোলার প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে অন্য কথা জিজ্ঞেস করে ফেলি, 'মাফ করবেন, এমন চমৎকার শার্ট কোথায় পেলেন?'

ভদ্রলোক মন দিয়ে একটা পেপার ব্যাক পড়ছিলেন। চশমার ফাঁকে ব্রাউন চোখ তুলে প্রশ্নকর্তাকে দেখলেন। চোখে হাসির ঝিলিক মারলো। তারপর ফিরিওয়ালা বোঝাই ফুটপাতের একদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওইখানে।'

আমি লাফিয়ে উঠি।

তখন আরেকটু হেসে বললেন, 'পাঁচ ডলার!'

'অ্যাঁ? এতো কম?' আমি আরো লাফাই। তারপরেই মিইয়ে পড়ি ঃ 'কিন্তু কিনতে গেলেই তো জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিছু নষ্ট হবে না, জায়গা ঠিক থাকবে।'

'আচ্ছা, আপনি কি এক্ষুণি কিনলেন জামাটা?'

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন।

আমি এতক্ষণে আমার প্রশ্নের মর্মটা বুঝতে পারি। আমার কথার মানে, উনি নিশ্চয় খালি গায়ে একজিবিশনে এসেছিলেন।

আমি আরো খারাপ কিছু বলতে পারার আগেই ভদ্রলোক উত্তর দেন- 'ঠিক তা নয়, গত হপ্তায় কিনেছি। এটা আমার দ্বিতীয়বার আসা। একদিনে তো দেখে শেষ করা যায় না। এক জীবনের শিল্পকর্ম।'

হাসলে একটা সোনা-বাঁধানো দাঁত দেখা যায়। আমাদের দেশের মতো।

'যান, কিনে আনুন। জায়গার জন্যে ভাবনা নেই।'

'থাঙ্কিউ।' বলে আমি ছুটি।

অল্পবয়সী একটি মেয়ে একটা ট্রাঙ্ক নিয়ে বসেছে। তার গায়েও ঐ গেঞ্জি। লালের উপর হলদেতে পিকাসোর ঢেউ-খেলানো স্বাক্ষর তার বুকে।

গেঞ্জি কিনে, এক টিন কোকাকোলাও কিনে ফেলি। এবং একটা হটডগ। এখন তো মোটে এগারোটা। আমাদের ব্যাচটাকে ঢুকতে দেবে সাড়ে এগারোটায়। মিউজিয়ামের ভিতরেই খিদে পেয়ে যাবে। খাদ্যের ব্যবস্থা অবশ্যই আছে সেখানে, দাম নিশ্চয়ই ঢের বেশি। কাঁধের শান্তিনিকেতনী ঝোলায় গেঞ্জিটি ঢুকিয়ে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে রাস্তার ধারে কালো পাথরের চওড়া সিঁড়ির ওপরে বসে পড়ি। হটডগে এক কামড়, কোকাকোলাতে এক চুমুক। আঃ অস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, পেট জুড়োলেই জগৎ জুড়োয়। কালচার করতে গিয়ে কম কষ্ট হয়েছে নাকি? আজ মেম্বার্স ডে। অপরের মেম্বারশিপ কার্ড সংগ্রহ করে, ভোর থেকে এসে লাইন দিয়ে সেই কার্ড দেখিয়ে এতক্ষণে টিকিট যোগাড় করেছি। নেহাত স্নেহপ্রবণ অশোকদার কল্যাণেই এটা দেখতে পেলুম। তাঁর স্ত্রীর কার্ডে চুরি করে আসা। আমার নাম এখন মেরি দত্ত। ঠিকানা গ্রীনিচ ভিলেজ। কোথায় আমি থাকি আর কোথায় এই পাড়া। কিছু খেয়ে বেরুইনি তখন। নিউইয়র্ক তো একগাদা দ্বীপের সমষ্টি, লস-এঞ্জেলেস যেমন একগুচ্ছ জনপদের সমষ্টি (ওরা বলে সিটি)। খেতে খেতে নিজের জায়গার দিকে কড়া নজর রাখছি। আমাকে ফেলেই মিছিল এগিয়ে না যায়। অনেকেই বসে পড়েছে আশপাশে। এটা-সেটা খাচ্ছে। আমেরিকার রাস্তাঘাটে সিগারেট খাওয়া এবং চুমু খাওয়া, দুটোই খুব কমে গেছে দেখছি। মেয়েরা তবু বরং পুরুষদের তুলনায় বেশি ধূমাবতী, নবলব্ধ স্বাধীনতার স্বাদ বলেই হয়তো।

দূর থেকে কিউটা দেখতে অন্যরকম লাগছে। কিউতে দাঁড়িয়ে বেশির ভাগ পুরুষ কিছু না কিছু পড়ছে। মেয়েরা গল্প করছে। সিগারেট খাচ্ছে। দেখতে দেখতে একটা পরিষ্কার প্যাটার্ন ফুটলো। যারা একা এসেছে কেবল তারাই বই পড়ছে। মেয়েরা প্রায় কেউই একা নয়। সঙ্গিনী বা সঙ্গী সমেত এসেছে। তাদের বই পড়ার দরকার নেই। যে পুরুষ একা নয়, তারাও বই পড়ছে না। মানুষ ফেলে বইকে সঙ্গী করেছে এমন হতভাগ্য এই কিউতে চোখে পড়ল না, সংসারে যদিও তাদের সংখ্যা কম নয়। একটা বই আনলেই হতো। আমার মতো একা মেয়ে তো আর চোখে পড়ছে না। ভাবতে ভাবতে হটডগ শেষ। কোকও খতম। এখন এগুলো জঞ্জালে পরিণত হয়েছে, ফেলব কোথায়? কাছাকাছি একটিও লিটারবিন নেই। শেষে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে একটা ডাস্টবিনে টিন আর ঠোঙাটি গুঁজে দিই।

কিউতে ফিরে আসতেই পেছনের সেই ভদ্রলোক বললেন, 'এই যে, স্বাগত। বিদেশীরাই নিউইয়র্ক নোংরা করে এই ধারণা যে ভুল, তার আরেকটা প্রমাণ পেলাম।'

'তার মানে?'

'মানে? ঐ যে, ঐ দেখ।' ভদ্রলোকের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি এমন ঝকঝকে ফুটপাতে তকতকে বিশাল মর্মর প্রাসাদের দেওয়াল ঘেঁষে ইতস্তত গড়াগড়ি যাচ্ছে একটি-দুটি সেভেন আপ-কোকাকোলার টিন, ছিটিয়ে আছে কিছু আইসক্রীমের কাঠি, সিগারেটের খাপ, চকোলেটের কাগজ, সভ্যতার চিহ্ন। এমন কিছুই নয়। দেখিয়ে না দিলে আমার চোখেও পড়ত না। কিন্তু এই দেশে এমন রাস্তার ধারে এটুকু জঞ্জালও বিসদৃশ, বেমানান। নাগরিক সৌজন্য বিরোধী আচরণ।

এই কিউতে যারা দাঁড়িয়ে আচেন, তারা নেহাতই শখের খাতিরে কষ্ট করছেন। এদের কখনো র‍্যাশনের থলি বা কেরোসিনের টিন নিয়ে কিউ দিতে হয়নি। এরা এসেছেন আমেরিকার 'কালচারাল ইভেন্ট অব দি ইয়ারে'

অংশ নিতে।

ভদ্রলোকের চোখের বিদ্রুপ দেখে লজ্জা পেয়ে বলে উঠি- ‘কর্পোরেশনের দোষ। এখানে কয়েকটা ডাস্টবিন রাখা উচিত ছিল।’

‘ডোন্ট ডিফেন্ড দ্য নিউইয়র্কার্স। তুমি যা করলে তারাও তাই করতে পারত। আমি তো এতক্ষণ তোমাকেই নজর করে দেখছিলুম, খাওয়া হলে তুমি কি করবে। শুনেছি ইন্ডিয়ানরা পুয়ের্তোরিকানদের মতোই গরিব। গরিব মানেই তো অমার্জিত, নোংরা। তাই দেখছিলুম। কার্যত দেখা গেল, একটা প্রাচীন সংস্কৃতির জাতীয় ইতিহাসকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি উলটে ফেলতে পারে না।’

ভদ্রলোকের দু-চোখে আলো জ্বলে। আমার মনে মনে খুব আহলাদ হলেও মুখে সত্যি কথাই বলি। ‘একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে এভাবে জেনারালাইজ করা যায় না। জঞ্জাল যথাস্থানে ফেলবার অভ্যেসটা কিন্তু আমার স্বদেশী শিক্ষা নয়। এটা নেহাতই ঔপনিবেশিক। বিলিতি শিক্ষা। আমরাও বড্ড পথঘাট ময়লা করি।’ বলতে বলতে কলকাতার বস্তিগুলোর আশেপাশে ফুটপাতের ধারে বসে থাকা অগুন্তি পথবাসী শিশুর প্রাতঃকালীন মূর্তি মনে ভেসে উঠলো। দেওয়ালে দেওয়ালে ‘এখানে প্রস্রাব করিবেন না’ শীর্ষক কাতর অনুনয়গুলিও যেন মনশ্চক্ষে পড়ে ফেললুম। শিক্ষিত, দায়িত্ববান পুরুষদের উদ্দেশেই তো এই বিনীত অনুরোধ। আর যত্রতত্র থুথু? ফর্সা শাড়িতে পানের পিক?

‘গরিবরা নোংরা হয় অভাবে।’ প্রায় অন্তর্যামীর মতোই ভদ্রলোক বললেন, ‘সাউথ আমেরিকায় অনেক সময়ে গ্রামের দিকে স্যানিটারি ব্যবস্থা না থাকায় প্রাকৃতিক কাজগুলি বনে-বাদাড়ে সারতে হয়। সরকারি টয়লেট থাকলে বা ঘরে-ঘরে ব্যবস্থা থাকলে কি তা করতে হতো?’

‘এখানেও যদি গারবেজ ক্যান থাকত, লোকে আর পথ ময়লা করত না।’

‘তুমি দেখছি এই শহরের নিন্দে সইতে মোটেই রাজি নও। কিন্তু তুমি আর কতোটুকু আসল নিউইয়র্ক চেনো?’

এমন সময়ে গেট খুলে দেয়। শান্তিপূর্ণভাবে দর্শকের মিছিল প্রবেশ করে প্রদর্শনীতে। ছোট বাগানটি পেরিয়ে গেটে ঢুকবার মুখে ছোট্ট ক্যাসেট রেকর্ডার পাওয়া যাচ্ছে, ভাড়া আড়াই ডলার। তাতে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিল্পকলার অধ্যাপক টেপড বক্তৃতা দিচ্ছেন, পিকাসো-প্রদর্শনীর গাইডেড-ট্যুর। চার রকমের নাকি চারটে বক্তৃতা আছে, চারটে ক্যাসেটে। কিন্তু কে যে কোনটা পাচ্ছে বোঝা গেল না। ভেতরে কোনো জ্যান্ত গাইড নেই। গাইড বুকটি থেকে ঘরগুলোর মেঝের নকশা ছাড়া কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। টেপ রেকর্ডের গাইডিং লেকচার নিলে তবু কিছুটা জানা যাবে। কানের মধ্যে ছোট্ট বোতাম গুঁজে গলায় পৈতের মতো ঝুলিয়ে রাখতে হবে রেকর্ডার যন্ত্রটা। আপন মনে কানে কানে গুনগুনিয়ে বক্তৃতা বাজবে। নিয়েই ফেললুম একটি যন্ত্র। বড় বড় ব্যাগ, থলি, সবই গেটে জমা রাখতে হচ্ছে, ভিতরে নেওয়া বারণ। ব্যাগ নিয়ে কুপন দিচ্ছে। এই কর্মে বেশ কয়েকটি গোঁট্টা-গোট্টা ভীম-ভবানী নিয়োজিত হয়েছে। দর্শকরা, বিশেষত মেয়েরা অনেকেই ব্যাগ ছাড়তে রাজি না। আর ভীম-ভবানীরা সব এক ধমকে কেড়ে নিচ্ছে। আমার ঝোলাটা নিয়ে কী যে করবে বুঝলাম না। আমার ঐ একটাই ব্যাগ বলে বোধহয় ছেড়ে দিল। তবে ভিতরটা দেখে নিলো একটু চোখ বুলিয়ে।

লন্ডনে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ভাইকিংদের ঐতিহাসিক জিনিসপত্রের একটি প্রদর্শনী চলছে এখন, মনে পড়ে গেল। ঢোকবার সময়ে যেখানে ব্যাগ চেকিং করা হচ্ছে, গোলগাল মাঝ-বয়সী ব্রিটিশ দারোয়ানটি হেসে হেসে চেঁচাচ্ছিল ঃ ‘যার যা কিছু বোমা-টোমা, অ্যাসিড-গ্যাসোলিন, বন্দুক-পিস্তল-ছোরাছুরি সঙ্গে আছে, আমার কাছে নির্ভয়ে জমা রেখে যাও, কুছ পরোয়া নেই, যাবার সময়ে সব ঠিকঠাক ফেরত পাবে।’ ব্যক্তিগত ব্যবহারের ব্যাগের অভ্যন্তর খুলে পরকে দেখানোর মধ্যে একটা যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন, যে অঘোষিত অবমাননা আছে, এই উদ্ভট বক্তৃতায় সেটা হাসির হাওয়ায় ভেসে উঠে যায়! অথচ এই মার্কিন দ্বারপালেরা আপন কর্তব্যনিষ্ঠার ভারে কী ভয়ানক গুরু-গম্ভীর এবং রূঢ়। যদিও তারা আমার সঙ্গে কপাল-গুণে রীতিমতো ভদ্রতাই করে ফেলেছেন!

প্রথমে এক নম্বর ঘরে ঢুকি, এখানে প্রধান ছবি 'বিজ্ঞান এবং বিশ্বাস'। পিকাসোর অল্প বয়সের নানা ছবির সঙ্গে ঊনিশ শতকে আঁকা ছবির মধ্যে রাখা। বিছানায় শায়িত রোগী। একপাশে পাদ্রী, একপাশে ডাক্তার, আশেপাশে উৎকণ্ঠ স্বজনবর্গ। বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মাঝখানে আয়ু।

এই ঘরে প্রচুর পেন্সিল স্কেচ। অ্যানাটমির প্র্যাকটিস। নানাদিক থেকে আঁকা একটি পায়ের ছবি। হাতের পাতার বিভিন্ন ভঙ্গী, দাঁড়ানো শরীর। সেই লিওনার্দোর নোটবুকে যেমন দেখা যায়। হাত-পায়ের পেশী সঞ্চালনের, অস্থি সঞ্চালনের ফলে যেভাবে শরীর নড়ে-চড়ে, ভঙ্গি বদলায়, তার একের পর এক পেন্সিল স্কেচ। শিল্পীর হাত পাকানোর এবং চোখ তৈরির প্রমাণ তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের উদাহরণ। আকৃতির ব্যাকরণটা পুরোপুরি অধিগত না হলে সেটাকে ভাঙবেন কেমন করে? ফর্মটা হাতে সম্পূর্ণ এসে যাবার পরেই তো ফর্মকে উত্তরণ সম্ভব? সে ব্রাকই হোন, বা পিকাসোই হোন, অথবা আমাদের যামিনী রায়ই হোন। পাকা হাত না হলে তো বাস্তবকে সরলীকরণ অথবা জটিলীকরণ কোনোটাই করা চলে না।

আমি অশিক্ষিত, গণ্ডমূর্খ। শিল্প জানি না, শিল্প সমালোচক নই। শিল্পরসিক কিনা সে কথা কেবল 'আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে'–অর্থাৎ শিল্পকর্মটি। ছবি দেখতে আমি ভালোবাসি, সময় পেলেই চলে যাই প্রদর্শনীতে। জীবন অনিত্য, যতো পারি দুটো চোখে ভরে নিই পৃথিবীটা।

আমি বিশ্বাস করি না, সঙ্গীত বা শিল্প বিষয়ে তথাকথিত 'শিক্ষিত' সমালোচক ভিন্ন আর কেউ মুখ খুলতে পারবে না। মন দিয়ে গান যে শোনে, মন দিয়ে ছবি যে দ্যাখে, তারই অধিকার আছে, কেমন লাগল বলার। এই যে আমি লিখি, কেবল অধ্যাপকরা ছাড়া আমার লেখা বিষয়ে কেউ কথা বলতে, মন্তব্য করতে পারবে না, এটা কি স্বাভাবিক? মন দিয়ে যে পড়ে সেই অধিকারী। গান শুনে ভালো কি মন্দ সবাই বলতে পারে, তার জন্যে সঙ্গীত-বিশারদ না হলেও চলে। ছবি দেখেও সব দর্শকেরই মত প্রকাশের যথেষ্ট অধিকার আছে বৈকি। সব দর্শক 'বোদ্ধা' কিনা সেটা ঠিক করে দেবার অধিকার কিছু কিছু মানুষ কেন যে নিজেদের মাথায় তুলে নেয়? যে যেভাবে দেখেছে, তার সেটাই বোধ। তার সেটাই দেখা। তার সেটাই চোখ। তার চোখে দেখা ছবিটা শুধু তারই। সেটা তো মিথ্যে নয়। ভুল-ঠিক অন্যে পরে বলবে কেমন করে? এসব কথা মনে হচ্ছিল, পিকাসো প্রদর্শনীতে কানে প্রচুর মন্তব্য আসছিল বলে। সে যে কী অদ্ভুত, কী প্রাণান্তকর সব কথা। এতক্ষণ লাইন বেঁধে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে যারা ভিতরে এলেন, তাঁরা অনেকেই পিকাসোর বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! আধুনিক চিত্রকলার ধারা বিষয়েই তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। অভিজ্ঞতা হিসেবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া থেকে আমার মাথায় অনেক জিনিস ঘুরে যাচ্ছিল, যে সারল্য ছবি দেখতে দেখতে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিউবিস্ট ছবি এখন আর আমাদের কাছে ধাঁধা নয়, আগে এক সময় যখন ধাঁধা ছিল, তখনকার কথা, সেই মনটা আমরা ভুলে গেছি। এদের কথা শুনে সেই সব আদি যুগের প্রতিক্রিয়াগুলি নতুন করে মনে পড়ে যাচ্ছিল।

যতক্ষণ ছবি প্রাচীনপন্থী, সরল, প্রচলিত, কর্মনিষ্ঠ, ততক্ষণ একরকম 'বাঃ, বাঃ' শুনেছি। নীল যুগ, গোলাপী যুগের পালা পর্যন্ত দর্শকরা রীতিমতো উৎসাহী। নীল যুগের দুঃখ-বোধ তাঁদের হৃদয়ে পৌঁছাচ্ছে, দুঃখী আর্লেক্যাঁর আজগুবি তালিমারা সং-এর সাজ-পোশাক, তাঁর গরিব বউ-বাচ্চা, ভবঘুরে অনাথ বালকদের কুকুর সমেত পথে পথে ঘোরার হতাশা দর্শকদের মন কাড়ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু যেই বিশ শতকে পা পড়ল পিকাসোর ছবি পাল্টালো, দর্শকদের মন্তব্যও সেই সঙ্গে পালটে যেতে লাগল– 'এমা, এটা কী! কী বিশ্রী! এর মানে কী?' চতুর্দিকে এইরকম সব শব্দ উঠছে। আমার মনে হচ্ছিল, টেপ করে দেশে নিয়ে যাই। শিক্ষিত মার্কিনী শহুরে সাংস্কৃতিক লেভেলের ছবিটা রেকর্ডেড হয়ে থাক।

ওরকম শব্দ উঠবে না কেন? গাইড নেই। টেপ করা বক্তৃতা থেকে তো কেউই কিছু শিখতে পারছে না! এরকম দারুণ একটা ঐতিহাসিক প্রদর্শনীতে কোনো বিবরণমূলক গাইড-বুক নেই, প্রফেশনাল গাইডও নেই। আশ্চর্য! বিপুল মোটা সুভেনির বইটা গেটেই কিনেছি। পঞ্চাশ ডলারের বই ছত্রিশ ডলারে পেয়েছি মেরি দত্তর জাদুঘরের মেম্বারশিপ কার্ডের কল্যাণে। কিন্তু সে তো গাইড বুক নয়, অন্য ব্যাপার। এই কলাম্বিয়ার অধ্যাপক মশাই যে রাম ঠকান ঠকিয়ে দিলেন সকলকে? সরকার এটা চলতেই বা দিচ্ছে কেমন করে? কানের বোতাম গুঁজে বক্তৃতা খুলে দিয়ে খানিক পরেই বোঝা গেছে বক্তৃতাটা পুরোপুরি বুজরুকি। যারা ঘোরতর শিল্প অজ্ঞ, চোখ মেলে একটা ছবি দেখতে পর্যন্ত জানে না, তাদের জন্যে কেবল কিছু কিছু ছবির ভাবগদগদ বাহ্যিক বর্ণনা করা হচ্ছে। না আছে শৈল্পিক ইতিহাস, না আছে শিল্প বৈশিষ্ট্য দর্শানো, না জটিলতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, না

নিহিত ভাবের ব্যঞ্জনা নির্দেশ! দূর দূর! রাগ করে সুইচ বন্ধ করে দিয়ে কান থেকে বোতাম টেনে খুলে ফেলি।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চমকে দিয়ে পাশে আর একটা গলা বেজে উঠলো, 'হলো তো? আড়াই ডলার জলে গেল। এদের যতসব ধান্দাবাজি। মার্কিন ব্যবসাদারী। হরদম লোক ঠকাচ্ছে। ওসবে কিসসু উপকার হয় না।' সেই পিকাসো-গেঞ্জী, সাঁইবাবা চুল, কিউ-এর প্রতিবেশী।

'এই যে ছবিটা, সামনেই যেটা– ভালো করে দ্যাখো, ব্রাকের প্রভাবে আঁকা এটা। এর নাম, স্টীল লাইফ উইথ পাইপস, কফিপট, অ্যান্ড কারাফ'–অথচ সেগুলো কিছুই দেখতে পাচ্ছো না তো? বেশ, ঘাবড়িও না, একটু ভালো করে খুঁজে দেখলেই পাবে। সব আছে। দ্যাখো, ঐ যে মাঝখানে কফিপটের আদল। ঐ পাশে দেখা যাচ্ছে কারাফের লম্বাটে গলা আর এইদিকে ঝুলন্ত সব পাইপের সারি।'

এবার সত্যি পায়ের তলায় মাটি পেলুম। কখন যেন ওর সঙ্গেই এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে শুরু করেছি ছবি দেখতে দেখতে। ভদ্রলোক অনেক কিছু জানেন, ছবি বিষয়ে। পিকাসোর বিষয়েও। অনেক ব্যক্তিগত গল্প জানেন তাঁর। পিকাসোকে দারুণ ভালোবাসেন বোঝাই যাচ্ছে।

হঠাৎ বললেন, 'স্পেনের স্পিরিটটাই আলাদা, আমারও তো স্প্যানিশ রক্ত কিনা? আমি পিকাসোকে খুব বুঝতে পারি।' ভদ্রলোকের এই কথাটা মোটেই মনে ধরল না আমার। রক্ত-ফক্ত নিয়ে গর্ব করা ভালো লাগে না আমার।

'পিকাসো তো ঠিক স্পেনের প্রতিভূ নন, বরং বলা যায় সমগ্রভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতারই।' সবিনয়ে বলতে গেলুম আমি।

কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন, 'কে বলেছে স্পেনের প্রতিভূ নন? পিকাসোর সঙ্গে আমার যোগ পূর্ব-পুরুষের রক্তে। আমার পূর্ব-পুরুষরাও স্পেন থেকেই এসেছিলেন সেই ষোলো শতাব্দীতে–বরিনকুয়েন দ্বীপে, আজ যার নাম পুয়ের্তোরিকো। আজও আমাদের মাতৃভাষা স্প্যানিশ। আমাদের আত্মার গহনে মিল আছে। ইস্পানী রক্তের তেজের ব্যাপারটা আলাদা।'

আমি বাপু আর ওকে ঘাঁটাই না, 'তা তো হতেই পারে! ..... হতেই পারে! ....কিন্তু আমার যে বড্ড পা ব্যথা করছে, একটু চা-কফি খেয়ে নিলে হতো না?'

চা খেতে খেতে জানা গেল ভদ্রলোকের নাম পাবলো গিয়েন।

আমি তো নেচে উঠি প্রায়।

'দুটোই জগৎ বিখ্যাত নাম! পাবলো কাসালস্, পাবলো নেরুদা, পাবলো পিকাসো– একই জগতে এতগুলো বিখ্যাত পাবলো আছে, তার ওপরে আবার গিয়েন? নিকোলাস গিয়েন এত বড় কিউবান কবি।'

'তুমি জানো?' পাবলো অবাক চোখে তাকায়, 'ভারতবর্ষের লোকেরাও জানে? নিকোলাস গিয়েনের কবিতা তোমরা পড়েছো?'

'বাঃ! পড়িনি? বাংলায় অনুবাদও হয়েছে তাঁর কবিতা। আচ্ছা, তুমি কি ওর আত্মীয় নাকি?'

'নাঃ। পদবিটা এক বটে, কিন্তু আত্মীয়তা নেই। কিউবা তো অন্যদিকে। পুয়ের্তোরিকোর ইতিহাস আলাদা।'

'কিন্তু কী করে জানলে, সম্পর্ক নেই? এককালে হয়তো ছিল? সেই স্পেনে? পূর্ব পুরুষের রক্তে হয়তো তোমরা এক ছিলে? পিকাসোর বেলায় এ কথা ভাবতে পারো আর একই পদবি নিয়েও গিয়েনের বেলায় ভাবোনি কেন? বংশধারাটা এক হবার সম্ভাবনা তো এখানেই বেশি।'

'পিকাসো তো খাঁটি স্পেনের লোক। অব ডিরেক্ট স্প্যানিশ অরিজিন। গিয়েন তো কিউবার।'

হঠাৎ বুঝতে পেরে যাই, এর মধ্যে একটা জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যাপার আছে। এরা চায় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে, কিন্তু অন্যান্য দ্বীপের উদ্বাস্তু স্বজাতির সঙ্গে গ্রথিত হবার স্বপ্ন এদের কাম্য নয়। কেননা, সেও তো অন্য এক দ্বীপান্তর। সেও তো অন্য এক কান্নার ইতিহাস। কী লাভ তাদের সঙ্গে জড়িয়ে? স্পেন

থেকে পুয়ের্তোরিকো। পুয়ের্তোরিকো থেকে নিউইয়র্ক। কবে থেকে শুরু হয়েছে এদের বাস্তু হারানোর পালা! সূত্র বাঁধতে হলে মাতৃভূমির সঙ্গে, স্পেনের কাছেই ফিরতে ইচ্ছে!

সত্যিই বিশাল প্রদর্শনী। সবটা একদিন একসঙ্গে দেখা যায় না। যখন রাস্তায় বেরুলুম, পা তো আর চলছে না। পা তো আর শিল্পরসগ্রাহী নয় চোখের মতো, সে বেচারি শুধু ভারবাহী! ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের ধারে নানারকম মজার কাণ্ড হচ্ছে। একটা কাগজের তৈরি মস্ত বাক্সের গায়ে লেখা, 'হিউম্যান জুক বক্স!' বাক্সের গায়ে স্লট কাটা। আর সাতটা গানের নাম লিখে সাতটা বোতাম আঁটা। যেটাই টানবে, স্লটে একটা 'কোয়ার্টার' (২৫ সেন্ট) ফেলে, ভেতরে সেই গানটা তখুনি শুরু হবে। বাইরে তিন-চারটি ছেলে-মেয়ে নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছে। গান শুরু হলেই তারা 'মিউজিক' দিচ্ছে। ভিতরে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, তাতে একটা প্ল্যাকার্ড ধরা, 'হেলপ মি গো থ্রু কলেজ'।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলুম, পাবলো ব্যাজার মুখে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ বলল, 'হলো গান শোনা? যত্তো ধনী তরুণদের খেলাধুলো। কলেজের খরচ না আরো কিছু! ঐ দ্যাখো। খোলাখুলি চলেছে বেআইনী জুয়ো খেলা। হয়তো এও বলছে, 'হেল্প মি গো থ্রু কলেজ!' হুঁঃ যত্তো মার্কিনী কায়দা!' দেখলুম, ফুটপাতে একটি ছেলে টেবিলে দাবার ছক পেতে বসে আছে। আশেপাশে বেশ ভিড়। তাকে দাবা খেলে হারাতে হবে বাঁধা সময়ের মধ্যে।

'পুলিশ এলেই ধড়ফড়িয়ে পালাবে।' পাবলো জানায়।

'তুমি খুব একটা মার্কিনীদের ভালোবাসো বলে মনে হচ্ছে না! তুমি বুঝি আমেরিকান নও? খাস পুয়ের্তোরিকান?'

'নাঃ! সেটাও ঠিক নয়। আমি এই শহরেরই স্থানীয় জঞ্জাল একটি। আমার বাবা যুদ্ধের সময় পুয়ের্তোরিকো থেকে নিউইয়র্কে চলে এসেছিলেন। এখনও আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ কেউ আসা-যাওয়া করেন। আমি নিজে কখনো যাইনি পুয়ের্তোরিকোয়।' মুখখানা দুঃখী-দুঃখী হয়ে যায় ভদ্রলোকের। চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন।

'কোথায় থাকো?'

'কেন, ব্রুকলিনে? তুমি দ্যাখোনি নিউইয়র্কের পুয়ের্তোরিকান ঘাঁটি?'

'নাঃ। আমি এই ম্যানহ্যাটনের বাইরে বড় একটা নিউইয়র্ক দেখিনি। একবার খালি স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ফেরিতে চড়ে স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তাহলে তুমি কেবল বড়লোকদের নিউইয়র্কটুকু দেখেছো।'

'তা কেন? হারলেম দেখেছি না? খাস নিগ্রোপাড়া? হারলেমের পাশেই থেকেছি কিছুদিন আমি।'

'কিন্তু নিউইয়র্কের অন্যান্য ঘেটোগুলো তো দেখোনি? ইহুদীপাড়া? ইতালীয়ান পাড়া? পুয়ের্তোরিকান পাড়া? এসব দেখনি তো? বাই দ্য ওয়ে, 'নিগ্রো' শব্দটা কিন্তু দশ বছর হলো আর এ দেশে চলে না। ওটা অসৌজন্য। বলতে হয় 'ব্ল্যাক'। এটাই চালু টার্ম।'

'খুব জানি সে কথা আমি! কিন্তু ব্ল্যাক শব্দটা কোন কারণে নিগ্রো শব্দের চাইতে কম আপত্তিকর, কম রেসিস্ট শব্দ বলো তো? বুঝি না বলে ইচ্ছে করেই আমি ওই তফাতটা মানি না। নিগ্রো মানে কালো। ব্ল্যাক মানেও তাই। আমার মাতৃভাষায় দুটো শব্দে কোনো ফারাক নেই।' রেগেমেগেই বলি।

'এসব ন্যাকা পার্থক্য আমার অর্থহীন লাগে। আমাদেরও হয়েছে যেমন 'তাঁতি নয় অন্তবায় বলবে, জেলে নয় ধীবর।'

'ওসব এঁড়ে তর্ক রাখো তো? নিজের ভালো চাও তো নিগ্রো শব্দটা বোলো না। ওটা এমন অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন

নেই এ দেশে, ইমোশনাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রশ্ন হয়ে গেছে। মার খেয়ে যাবে কাউকে 'নিগ্রো' বললে।' প্রায় ধমকে ওঠেন ভদ্রলোক। বড় মজা! ধমকালেই হলো?

'কিন্তু আমি নিজেও তো কালোই। ব্ল্যাক। শুধু শুধু মার খাবো কেন?'

'ব্ল্যাক? বেশ তো ভালো কথা। তুমিও ব্ল্যাক। কিন্তু তুমি নিগ্রো কি? ইণ্ডিয়ার লোকেরা কি নিগ্রো? নিগ্রয়েড গ্রুপ?'

'না, তা অবশ্য ঠিক নই।'

'তবে? আর করবে এঁড়ে তর্ক? ব্ল্যাক আর নিগ্রো শব্দের তফাতটা এবারে বুঝে দেখলে তো? অস্থিমজ্জা চুলের ডগায় পর্যন্ত তফাত। ঐখানেই তো আসছে রেসিজমের প্রশ্ন। এবার বুঝলে তো? ব্ল্যাক, ব্রাউন, এসব শব্দ কেবল রঙের ব্যাপার। বর্ণভেদটা ওপর ওপর।

গভীর নয়। রক্তের নয়। কিন্তু 'নিগ্রো' অন্য ব্যাপার। জাতিভেদ। সাবধানে চলবে। এসব খুব স্পর্শকাতর শব্দ এ দেশে।'

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। বাস স্টপ এসে পড়ল। আমার গন্তব্য ইউনাইটেড নেশন্‌স্। ক্রসটাউন বাস ধরতে হবে। বাস স্টপে পৌঁছে পাবলো গিয়েন বলল, 'কোনদিকে যাবে? আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি!'

'বেশ তো, চলো না। আমি যাচ্ছি ইউ.এন.ও। যেতে যেতে আরও কিছুটা গল্প হবে।'

'তোমায় কি যেতেই হবে ইউ.এন.ও? কী হবে ওখানে গিয়ে?' পাবলো ভুরু কুঁচকে বলল, 'ইউ.এন.ও একটা অতি বাজে র‍্যাকেট। যত্তোসব বড়লোক দেশের ষড়যন্ত্রের জায়গা। সত্যি সত্যি গরীবদের বিন্দুমাত্র কাজে লাগে না ওরা। ওখানে কী করতে যাবে?'

উত্তরে আমি কী আর বলব? কথা ঘুরিয়ে বললুম, 'আর তুমি? এখান থেকে এখন তুমি যাবে কোথায়?'

চা খেতে খেতে জানতে পেরেছি নিউইয়র্কে প্রধানত দরিদ্র পুয়ের্তোরিকানদের জন্য একটা নতুন কলেজ হয়েছে। 'বরিনকুয়েন কলেজ'। কারিগরি বিদ্যা, কমার্স এবং কলা বিভাগ আছে। দ্বিভাষিক কলেজ। ইংরিজি ও স্প্যানিশ দুটোতেই শিক্ষা চলে। এটাই তার নতুনত্ব। পাবলো গিয়েন নিজে শিল্পী, সে ঐ কলেজে অধ্যাপনা করে কমার্শিয়াল আর্টের। পাবলো বলল, 'আমি তো যাব এখন কলেজে। জানো, আমাদের একজন ইয়াং ইণ্ডিয়ান কোলীগ রয়েছে? ইংরিজি বিভাগের চার্জে। কাজে-কর্মে খুবই উৎসাহী ছেলে। আমাদের কলেজের একমাত্র পিএইচডি সেই, রেক্টরকে বাদ দিলে। আমাদের রেক্টরও পিএইচডি এবং খোদ পুয়ের্তোরিকান। চমৎকার মানুষ। তাঁর চেষ্টাতেই কলেজটা গড়ে উঠেছে।'

মাত্র দু'জন পিএইচডি'ওলা অধ্যাপক নিয়ে নিউইয়র্ক শহরে একটা মার্কিন কলেজ চলছে! এও সম্ভব? এখানে তো ইনস্ট্রাকটর পদের জন্যেও পিএইচডি লাগে। কলেজের প্রসঙ্গ উঠলেই দেখেছি পাবলোর সব ধনতন্ত্র বিদ্বেষ, রাজনৈতিক তিক্ততা চলে গিয়ে গড়ে তোলার বিমল আনন্দ উথলে পড়ে। ভারতীয় সহকর্মী আছেন শুনে আমারও উৎসাহ জাগে, 'তিনিও স্প্যানিশ জানেন?'

'তা জানে বৈকি। তবে তাকে তো বেশি স্প্যানিশ বলতে হয় না, সে পড়ায় ইংরিজি। তবে কাজ চালাতে পারে। তুমি কি স্প্যানিশ জানো? কিংবা পর্তুগীজ? ইণ্ডিয়ায় তো পর্তুগীজরা ছিল?'

'নাঃ।'

'কী করছ তুমি এদেশে? বেড়াচ্ছ? ট্যুরিস্ট বুঝি? না ছাত্রী? তোমার নাম কি? ইন্ডিয়ার কোথায় থাকো?'

এতক্ষণে সেই মোক্ষম প্রশ্নটি এল। অন্যরা প্রথমেই যা শুধোয়। পাবলো নেহাৎ পাগল বলে এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে। প্রশ্নটা শুনলেই মন খারাপ। রোজ রোজ আয়নায় একই মুখ দেখা, চিঠিতে একই নাম সই করা, সব সময়ে একই উত্তর দেওয়া। আমি কে। কী করি। কোথায় থাকি। আমার বুকের ভেতরে কেউ চীৎকার করে

উত্তর দিতে চায়, আমি কেউ না। কিছুই করি না। কোথাও থাকি না। আমার কোনও বাঁধাধরা নাম নেই। পারমানেন্ট অ্যাড্রেস নেই। আমি শুধুই আমি। আমি শুধুই আমার। এই আলো-বাতাস যেমন। ফুলের গন্ধ যেমন। প্রকৃতি ছাড়া আমার কোনও নিয়ন্তা নেই। ইচ্ছে করলেই এখুনি মরে যেতে পারি, কিংবা চলে যেতে পারি পাপুয়া আয়ল্যান্ড, কি উত্তমাশা অন্তরীপে। প্রত্যেকটি দিন ফুরোলে সেটা আমার 'পূর্বাশ্রম' হয়ে যায়। প্রত্যেক সকালে নবজন্ম। কিন্তু এমন ইচ্ছেমাফিক কথা বলবার মত মনের জোর এখনও হয়নি। শীর্ণকায় মানিব্যাগ আর স্ফীতকায় দায়-দায়িত্বের বোঝা নিয়ে, এই দূর-বিদেশে এসেও কি মুক্তি আছে?

অথচ ওই কথাগুলো মিথ্যে নয়। ভয়ংকর সত্যিকথা। ওটাই সত্য। এই আমিটা নকল, মিথ্যে। মাথায় সংসারের শামলা এঁটে সং-এর মতো গম্ভীরসে ঘুরছি, যেন একটা কে না কে! ভেতরে ভেতরে, বুকের মধ্যিখানে একটা শেকল বাঁধা বাদী মানুষ চীৎকার করে অনবরত ওই কথাগুলো বলে যাচ্ছে। কেবলই বলে যায়। সে কি তবে মিথ্যে বলে? প্রাণটা কি তবে মিথ্যে বলে? বুকের মধ্যে নিজের যে একটা গোপন চেহারা আছে যেটা ছোট্টবেলা থেকে একলা হলেই 'নবনীতা' বলে ডাকলেই দৌড়ে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়, সেটা কি তবে মিথ্যে? আর আসল এইটে? যেটা ছেলে পড়ায়, দাঁত মাজে, বাজারের হিসেব করে? দূর! সেই অন্য চেহারাটাই আসল।

মনে যাই বলুক, ইচ্ছের গালে থাবড়া বসিয়ে দিব্যি শুনতে পেলুম, জিভ বলছে, 'আমার নাম নবনীতা। আমি কলকাতাতে থাকি।' জিভের আর দোষ কি? সমাজ তাকে যেমন ট্রেনিং দিয়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে, সে তো তাই বলবে!

'নো-বো-নি-টা! বেশ মিউজিক্যাল নাম কিন্তু! তুমি কী কর? পড়ছ বুঝি? ছাত্রী?

'নাঃ, এই লিখি-টিখি।'

বলতে ইচ্ছে করল না, ছাত্রী নই, মাস্টার। কেমন যেন বেনানান শোনাত, কেমন একটা সঙ্কোচ হলো।

'লেখ?' পাবলো তো লাফিয়ে উঠল ঃ 'বাঃ! বাঃ! সত্যি? তুমিও একজন শিল্পী তাহলে! অ্যাঁ? ভারতীয় লেখক? কী লেখো তুমি? কবিতা? গল্প? উপন্যাস? নাকি ডিটেকটিভ গল্প? মেয়েরা তো ডিটেকটিভ উপন্যাসের রাজা!'

'গল্প-উপন্যাসও লিখি, তবে সবচেয়ে বেশিদিন লিখেছি কবিতা।'

'কবি? তুমি একজন কবি? পাবলোর চোখে-মুখে নির্ভেজাল মুগ্ধতা ফুটে ওঠে। যা কবিতার প্রতি উদ্দিষ্ট, স্পষ্টতই আমি এখানে নিমিত্তমাত্র। এতক্ষণ তো কই এই মুগ্ধতা দেখিনি?

'বাঃ! এ পোয়েট ফ্রম দ্যা ল্যাণ্ড অফ টাগোর!' পাবলো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'কী চমৎকার যোগাযোগ। চল না একটুখানি আমাদের কলেজে, একটা বক্তৃতা দেবে? লেখক আমরা কখনও পাইনি।'

'কালই তো চলে যাচ্ছি। বক্তৃতা দেব কবে? তাছাড়া আমি কি স্প্যানিশ জানি?'

'কালই?' পাবলোর গলায় দুঃখ ঝরে পড়ে, 'কালকে কখন? স্প্যানিশটা জরুরি নয়। সবাই ইংরিজি বোঝে।'

'রাত্রের প্লেন।'

'তাহলে বিকেলে বক্তৃতা দাও? ফোর ও ক্লক?'

'তাই কখনও হয়? বক্তৃতা দেবার মুড থাকে নাকি যাবার দিনে? প্যাকিং আছে না!'

'আচ্ছা তোমাকে কি এখন ইউনাইটেড নেশান্সে যেতেই হবে? আগে কখনও দেখনি ইউনাইটেড নেশান্স বিল্ডিং? অবশ্য দেখার মতই।'

'কেন দেখব না? ওই বিল্ডিং-এ আমার স্বামীর অফিস ছিল। বহুবার দেখেছি। ওসব টুরিস্ট ইন্টারেস্ট আর নেই বাপু। আমেরিকা আমি বিশ বছর ধরে চষে ফেলেছি ....।'

'তবে কেন যাচ্ছ?'

‘কাজ আছে।’

‘কী কাজ? খুব কী জরুরি? অফিসিয়াল কিছু? চাকরি-বাকরি?’

‘নাঃ! ওসব নয়। এমনি সোশ্যাল ভিজিট। একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।’

এ কী যন্ত্রণা? আমার ব্যাপারে তুমি কেন নাক গলাবে? ভদ্রলোকের অতিরিক্ত কৌতূহলের জন্য বড্ড বিরক্ত লাগছে। এটাই হচ্ছে লাতিন চরিত্রদোষ! বড্ড গায়ে পড়া। অ্যাংলো-স্যাকসনদের কাঠখোট্টা দূর দূর পর পর স্বভাব বরং ঢের সুবিধেজনক। লাতিনদের এই জোর-জুলুম, ঠিক যেন বাঙালীদের ‘আর একমুঠো ভাত দিই’ বলে পেট ফাটিয়ে দেবার মতন।

‘বয়ফ্রেন্ড?’

‘ধ্যাৎ, অন্য ব্যাপার।’

‘তাহলে যেতে হবে না তোমার সোশ্যাল ভিজিটে।’ গম্ভীর মুখে উপদেশ দেন সদ্য পরিচিত পরমাত্মীয়টি।

‘বলে দাও তুমি, আজ খুব ব্যস্ত, আসতে পারবে না।’ তারপর হাত তুলে দেখায়, ‘ঐ যে টেলিফোন।’

দূরে একটা লাল ফোন বুথ। আমি এবার ক্ষেপে উঠি।

‘সে কী? কেন বলবে তো? আমার এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমাকে যেতেই হবে। আচ্ছা, চলি তবে। দেখা হয়ে বেশ ভাল লাগল। গুড লাক, অ্যান্ড গুড বাই।’

পাবলো এগিয়ে এসে কাঁধে একটা আলতো বন্ধুত্বের হাত রাখে। সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে সহজ হাসে। গুডবাই বলে না। বলে, ‘কবি হয়ে এত চটে গেলে হয়? কবিদের চাই অসীম ধৈর্য।’

‘আবার জ্ঞান? আরও জ্ঞান? আমি আরও চটে উঠি, বলি, ‘আমার তাড়া আছে, পাবলো।’

‘গোলি মারো তোমার তাড়ায়।’ একটুও না চটে হাসিমুখে পাবলো বলে, ‘বয়ফ্রেন্ড তো নয়। বরং আমার সঙ্গে গেলে একটা নতুন নিউইয়র্ক দেখাতুম আজ তোমাকে। দি আদার আমেরিকা। গরিবদের সঙ্গে মিলতে-টিলতে ইচ্ছে হয়? গরিব দোকানে ঢুকে গরিবদের সঙ্গে খানাপিনা? দেখবে নতুন আনকোরা এক নিউইয়র্ক? পুয়ের্তোরিকান ঘেটোর?’

‘কিন্তু আমার যে একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা। তাঁর সঙ্গে যাবার কথা এখন নিউজার্সি।’

‘দূর দূর। নিউজার্সিতে কেউ যায়? ন্যুড শো ছাড়া নিউজার্সিতে আছেটা কি? সে তো এখন এখানেও আছে।’

‘ওসব নয় ধুত্তোর। ওখানে কয়েকজন ভারতীয় আছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করব বলে....।’

‘ওহো তাই বলো। ভারতীয়দের ভাল করে দেখবে শুনবে বলেই তুমি নিউইয়র্কে এসেছ।.... কী? তাও নয়? তবে চল আমার সঙ্গে কলেজে। কত কি নতুন জিনিস দেখবে। মাইক হ্যারিংটন পড়েছ। অবশ্য ওতেও পাবে না এই ‘স্প্যানিশ গরিব’দের কাহিনী। এরা তো কালো নয়, এরা তো স্লেভ ছিল না, এদের নিয়ে বাড়াবাড়ি হয় না। এদের নিয়ে বই লেখার চাড় নেই কারুর। এদের দুঃখ-দুর্দশা-দৈন্য সব চাপা পড়ে যায়। এই যে ফোনবুথটা এসে গেছে। ঢুকে পড় দিকিনি?’

‘এই বিকেলবেলায় কলেজে গিয়ে কিছু লাভ হবে?’ আমি সামাল দিতে চেষ্টা করি, ‘সবাই তো চলে যাচ্ছে এখন।’

‘কে বললে চলে যাচ্ছে! সবাই আসছে। ইভনিং কলেজ না আমাদের? দিনভর তো ছাত্ররা রুজি-রোজগার করে। কুলি-মজুরি, দোকান-পাট, চুরি-চামারি, পকেটমারা, খুন-খারাপি সারাদিন কতো ব্যস্ততা তাদের। কলেজটা যদি চব্বিশ ঘন্টাই করা যেত ওদের।’

আমার চোখে বোধহয় বিস্ময় ফুটেছিল। পাবলো ব্যাখ্যা করে, ‘ব্যাপারটা কি জানো, পুয়ের্তোরিকানরা এখানে

একটা সাব-প্রোলেটারিয়ান গ্রুপ, বুঝলে? মার্কিনী সাব-প্রোলেটারিয়াট কী বস্তু একটু দেখবে না? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে হুড়মুড়িয়ে পুয়ের্তোরিকানরা নিউইয়র্কে এসেছে পেটের দায়ে, কাজের খোঁজে। তারপর আস্তে আস্তে কখন ভিখিরি হয়ে গেছে। কাজ নেই, খাবার নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। আমাদের বাবারা সব সেই সময়ের আমদানি। সুস্থভাবে বাঁচার মালমসলা আমাদের কিছুই নেই। আমাদের একটু দেখে চিনে যাবে না? কেবল তো ডব্লিউ. এ. এস. পি. আমেরিকাকেই তোমরা চেনো, হোয়াইট, অ্যাংলোস্যাকসন, প্রোটেস্ট্যান্ট, পাওয়ারফুল আমেরিকা। আর অপরপক্ষে ব্ল্যাকদের! আর চিনেছ হয়তোবা ইহুদীদের। তারা আবার ইন্টেলেকচুয়াল লীডার্স অব আমেরিকা– হিস্পানীদের চিনবে না? দি ওল্ডেস্ট কালচারাল গ্রুপ।'

'ফিরতে বেশি দেরি হবে না তো?'

'ফেরার কথা ভেবে কোথাও যাবার বয়স কি তোমার এখনই হয়েছে বন্ধু? যাও, ঢুকে পড়ো দেখি লক্ষ্মী মেয়ে? বলে দাও আজ যাওয়া হলো না.....।' ছোট্ট একটা বাও করে বুথের লাল দরজা খুলে ধরে হাসে পাবলো।

সত্যিই তো, এমন সুযোগ কি আর পাবো পুয়ের্তোরিকান ঘেটোটা দেখার? কী হবে পার্টিতে গিয়ে, দেশোয়ালী ভাইদের সঙ্গে দিল্লী-কলকাতা আর বোম্বাইয়ের হাঁড়ির খবর নিয়ে কথা বলে? বেগুনভাজা, মুরগির ঝোল আর ভাত খেয়ে? দূর.... ঠিকই বলেছে পাবলো গিয়েন।

ফোনবুথ থেকে বেরিয়ে দু'জনে মিলে চললুম সাবওয়ে স্টেশনের দিকে। ব্রুকলিনে যেতে হলে বাস নয়, সাবওয়ে ট্রেন ধরতে হবে। উরিব্বাবা! কী ভিড়! নিউইয়র্কের রাশ-আওয়ার শুরু হয়েছে। ট্রেনে তো উঠেও পড়লুম। ভিড়ের চাপে মাটিতে পা ঠেকল কি ঠেকল না কে জানে? ব্যাগ, আঁচল আর চশমা সামলাতেই প্রাণান্ত। তাও তো প্রচণ্ড গরম বলে শালটা নেই সঙ্গে। পাবলো ঠিক নজরে রাখছে, কাছাকাছিই আছে, এক সময়ে ভিড় আমাদের একটা জানালার খুব কাছে এনে ফেলল। দেখি বাইরে দিনের আলো। এখন ট্রেন মাটির ওপর দিয়ে যাচ্ছে। একটা ব্রীজ পার হচ্ছি। পাবলো অস্থির হয়ে কী যেন বলতে লাগল। কিছুতেই শুনতে পেলুম না। ট্রেনের মধ্যে প্রচণ্ড আওয়াজ। আন্দাজ করলুম এই বোধহয় ব্রুকলিন ব্রীজ!

নিউইয়র্কের সাবওয়েগুলো দেখলে দেশটাকে গরিব ভিখিরির দেশ বলে মনে হবে। ইংল্যান্ডের টিউব স্টেশনগুলো কতো ঝকঝকে, তকতকে, আধুনিক। কতো পরিচ্ছন্ন, অনেক বেশি আলো ঝলমলে। এতো প্রচণ্ড শব্দও তো হয় না সেখানে? এখন স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। বাপরে! যেন একশোটা বোমা ফাটিয়ে পিলে চমকিয়ে! কর্ণ-পটাহ বিদারিত করে। প্যারিসের নতুন মেট্রো স্টেশনগুলো তো ইংল্যান্ডের আন্ডার-গ্রাউন্ডের চেয়েও ঢের সুন্দর এখন। ঠিক যেন কোন বিলাসী বাবুর বৈঠকখানা। আমাদের শহরে ভূগর্ভ রেল কেমন হচ্ছে, কে জানে? এরচেয়ে ঢের বেশি দীন-দরিদ্র চেহারার হবে, তা হোক। ভেঙে না পড়ে ছাদটা। আমাদের তো আবার গরিব দেশ। সিমেন্টের বদলে গঙ্গামাটি! শহর শুদ্ধ না তলিয়ে যায় ভূগর্ভ রেলের গর্ভে। সেতু পার হবার সময়ে চোখে পড়ল একদিকে জাহাজ, বন্দর, জেটি। এটাই হয়তো ব্রুকলিন নেভাল ইয়ার্ড। অনেক শুনেছি এর কথা। খানিক পরেই চমকে উঠি। আমার হাত ধরে দূর থেকে ভিড়ের মধ্যে কে প্রাণপণে টানছে! পাবলো। এবার নামতে হবে। কোনরকমে তো ভীম-ভবানীর মতো মাসল ফুলিয়ে প্রচণ্ড মারামারি করতে করতে প্রাণের দায়ে নেমে পড়লুম।.... যাক, অবাক কাণ্ড! ঝুলি, চশমা, হাত-পা, শাড়ি-টাড়ি সবই অক্ষত আছে।.... কী আশ্চর্য স্টেশন! লোহার গারদ দেওয়া জেলখানার মতো দেখতে সরু প্ল্যাটফরম বেয়ে লোহার সিঁড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা নীচে নেমে, দোতলা থেকে এক সময়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

এ কী? এ কোন শহর? কোথায় ছিল ব্রডওয়ে, লেক্সিংটন, টাইম স্কোয়ার, ম্যাডিসন, ফিফথ অ্যাভিনিউ– আর এটা? রাস্তাময় কাগজের টুকরো উড়ছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া। ফলের খোসা। আইসক্রীমের কাঠি আর খুরি ছড়ানো। কোকাকোলার টিন গড়াচ্ছে। যেখানে-সেখানে কাদা। জল জমে ছোট-ছোট পুণ্যিপুকুর হয়ে আছে। অথচ বৃষ্টি হয়ে গেছে বলেও মনে হচ্ছে না ঠিক। জল ফেলেছে মানুষই। ফুটপাতে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কাপড়-চোপড়। বাসন-পত্তরের দোকানের সারি। কী সস্তা সব জিনিসের দর! আর কী খেলো, সস্তা চেহারার সব জিনিস! চতুর্দিকে যেন শাশ্বত সেল চলছে। তাছাড়া একটা মেলাও যেন বসেছে, এমন দৃশ্য। ফুটপাতে খালি পা ছড়িয়ে বসে একটা কালো চুল বাদামি গা বাচ্চা মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছে। আহা, ওর কি কেউ নেই?

বাচ্চাটাকে দেখতে ঠিক ভারতীয় বাচ্চাদের মতোই। পুয়ের্তোরিকানদের ভীষণ ভারতীয় ধরনের চেহারা। বাদামি চামড়া। আমাদের মতোই নরম কালো চুল, কালো চোখ। বিশেষত মেয়েদের মধ্যে একটা আলগা চটক আছে, দিশি-দিশি দেখায় আরো তাতেই। নয়পাল যে বলেছিল, কলকাতা একটা বিরাট প্রস্রাবাগারের মতো। এখানেও গন্ধটা নেহাৎ অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

রাস্তায় লাল-নীল রংদার বরফ আইস বিক্রি হচ্ছে। সেই যেগুলো আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। দু-আনার বরফ খেলেই জন্ডিস, টাইফয়েড কিংবা কলেরা। এখানেও খেলেই ঐ একই ফল হবে বলে মনে হল। সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। ফলের খোসায়, কাগজের ঠোঙায় যেন পা না পড়ে।

চারদিকে অন্যরকম মানুষ। ফুটপাতে টেবিল পেতে তাস খেলা হচ্ছে। সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে। বাচ্চারা রাস্তায় খেলছে। হঠাৎ পাবলো আবার আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান লাগাল। প্রায় হুমড়ি খেয়ে তার ঘাড়ে পড়ে যাই। জানালার ভিতর থেকে একটা আধ-খাওয়া কোকাকোলার টিন রাস্তায় এসে পড়ল, তরল পদার্থ ছড়াতে ছড়াতে। ঠনঠন শব্দে বাজনা বাজিয়ে সে রাস্তার ওপারে রওনা হলো, মধ্য পথে থেমে যাবে।

'বার? হ্যাঁ, বার।' ভিতর থেকে হা-হা অট্টহাসি ভেসে এলো।

'এই ব্রুকলিন?'

'এই ব্রুকলিন। তোমার শাড়িতে লাগেনি তো? আমি দুঃখিত।'

'নাঃ। লাগেনি।'

'কেমন লাগছে? এই নিউইয়র্ক?'

'আশ্চর্য!'

'ভালো করিনি এখানে এনে তোমায়?'

'খুব ভাল করেছ। খুব ভালো।'

'আইসক্রীম খাবে? গরম হচ্ছে তোমার।'

'না, না। ওরে বাবা।'

'তোমার নাকে ঘাম।'

'নাক আমার সর্বদা ঘেমেই আছে। ওর কথা ছেড়ে দাও।'

'তোমার কপালে, গালে, ঘাম।'

'আমি দুঃখিত।'

'ভয় করছে নাকি?'

'দূর । ভয় করবে কেন?'

'একটা কোকাকোলা খাবে? ঠাণ্ডা?'

'তা বরং খেতে পারি।'

পথে ঠেলাগাড়ি থেকে হটডগ, হ্যাম্বার্গার বিক্রি হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে বাক্স থেকে আইসক্রীম-কোণ, কোকাকোলা। পথের বাক্সওয়ালার কাছে একটা কোকাকোলার টিন কিনে, তাতে নল ভরে খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে হাঁটি। দেখলুম রাস্তা ভর্তি মেয়েরা, নিগ্রো এবং পুয়ের্তোরিকান দুই-ই, খেতে খেতে দিব্যি পথ হাঁটছে। পাবলো কোকাকোলা খাচ্ছে না।

'কোথায় তোমার কলেজ? আর কতদূর?'

'ঐ যে। সামনেই। এসে গেছি।'

রাস্তায় কতগুলি গুন্ডা-মস্তান টাইপ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে। রাস্তা জুড়ে। আমাদের দেখেও পথ ছাড়ল না। প্রত্যেকের হাতেই খবরের কাগজে মোড়া মোড়া কী সব টিন। টিনেই মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে পান করছে। পরনে গেঞ্জি, গলায় সরু চেন, হাতেও চওড়া চেন, মুখে অবিশ্বাসের আর ঘৃণার ছাপ। একটুও না নড়ে তারা আমাদের নিরীক্ষণ করতে থাকে। এরা কারা? কী খাচ্ছে? মুখে কিন্তু প্রশ্নটা করি না। পাবলো তো বাংলা জানে না। এবং এরা তো ইংরিজি বোঝে। ওদেরই ফুটপাত ছেড়ে দিয়ে, আমরা রাস্তায় নেমে এসে আবার ফুটপাতে উঠি। আপনিই হাতটা গলায় চলে আসে। যাক, হারটা ছিনতাই হয়নি। এবার ফিসফিস করে প্রশ্ন করি, 'এরা সব কারা, পাবলো?'

'কেন? এ পাড়ার বাসিন্দেরা। এদেরই কেউ কেউ ভবিষ্যতে আমাদের ছাত্র হবে আশা করছি। এরা ছাত্রদেরই আত্মীয়-স্বজন আর কি।'

'এরকম ছাত্র?' ভয়ে ভয়ে বলি।

'আবার কী? পথভ্রষ্টদের জন্যই এই কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, পুয়ের্তোরিকানদের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অপরাধপ্রবণতা, আর অপসংস্কৃতি থেকে উদ্ধারের জন্যই তো এই কলেজ। এক রকমের সোশ্যাল ওয়ার্কও বলতে পারো। কেরিয়ার কাউনসেলিংও হয়। মাস্টারদের খুব ধৈর্য লাগে। আমাদের একজন তো খুনই হয়ে যাচ্ছিল টিউটোরিয়াল ক্লাসে। এক প্রোফেসর।'

'খুন? খুন হয়ে যাচ্ছিল? কার হাতে?'

'আবার কার? এক ছাত্রের হাতে! .... কী? চলে আসবে নাকি আমাদের কলেজে? ইন্ডিয়া থেকে? কোর্সেস ইন ইন্ডিয়ান কালচার পড়াবে? টাগোর পড়াবে? রেসিডেন্ট পোয়েট হয়ে থাকবে! ভেবে দ্যাখো। আমরা লোক নিচ্ছি কিন্তু। উই আর একসপ্যানডিং। থিংক অ্যাবাউট ইট!' দুষ্টু-দুষ্টু হাসিতে সোনার দাঁতটা ঝকঝক করে ওঠে। এ পাশে হাওড়া-হাট জাতীয় জামা-কাপড়ের দোকান। ফুটপাতে আলনা সাজিয়ে, চেঁচিয়ে দর হাঁকছে ব্যাপারী। ওপাশে দাগী ফলের সস্তা সবজিপাতির মাঝখানে একটা ছোট দরজা। সেটা ঠেলে পাবলো বলে, 'এসো। এই আমাদের কলেজ।' মোড়ে হরিসংকীর্তনের মতো ব্যান্ড বাজাচ্ছে ধড়াচুড়োপরা স্যালভেশন আর্মির বৃদ্ধারা। 'স্যালিজ।' ওদের দিকে চেয়ে ঠাট্টা করে হাসল–পাবলো, 'গরিবদের তবু কিছু সাহায্য করে অবিশ্যি ওরা!'

এরচেয়ে অবাক আর কিছুতেই হতুম না! এ যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও হার মানায়। তার এক তলায় গামছা বিক্রি হয় বলে কত না হাসাহাসি শুনতে হয়েছে। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে বিশাল বিশাল অট্টালিকা। আমরা ছোটবেলায় দেখতে পেয়েছিলুম সিনেট হলের সেই সাদা থাম সাজানো গ্রীক প্যাটার্নের দালান। কিন্তু এ কী! আমেরিকায় গত বিশ-বাইশ বছর ধরে একটা নিছক ভাল জিনিস দেখেছি ঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোও অবস্থাপন্ন। অঢেল তাদের অর্থ। তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ক্যাম্পাস তৈরি করতে ভালোবাসে। শহরের বুকে তা সর্বদা সম্ভব না হলেও বিরাট বিরাট প্রাসাদ অট্টালিকার সদর্প অহঙ্কারে বাবেীর বেদীস্থাপনা হয়।

কিন্তু এটা যে নেহাত কলকাতার সস্তা সেলুনের মত দেখতে একটা সুইংডোর! হায়রে পুয়ের্তোরিকান আমেরিকান! এতই দরিদ্র তুমি? এত হাঁ-ঘরে? সামনে খাড়া, সরু, ধুলোময়লা ভরা কার্পেটবিহীন একটু সিঁড়ি উঠেই তার মুখে আবার একটি দরজা। কাঁচের, বন্ধ, প্রাইভেট ফ্ল্যাটের মতো এনট্রেন্স। এ আবার কেমন ধারা কলেজ? প্রবেশদ্বার দেখেই ঘাবড়ে গেছি।

'এখন তোমার ক্লাস আছে নাকি, পাবলো?'

'না, একটা মিটিং ছিল, কিন্তু ক্যানসেল করে দেব ভাবছি তোমার অনারে।'

'মিটিং ক্যানসেল করে দেবে? সেও কি সম্ভব?'

আমি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়েছি দেখে পাবলো হালকা হাসে ঃ 'কেন, অসম্ভব কেন? মিটিং মানুষের জন্য, না মানুষ মিটিং-এর জন্য?

'আমরা এখানে বুরোক্র্যাসীর দাসত্ব করি না।'

আমি তবুও হতভম্ব।

'কিন্তু, মিটিং-এর অন্য সদস্যরা?'

'আজ তোমাকে নিয়েই মিটিং হবে। আমাদের অফিশিয়াল সমস্যা তো কালও থাকবে, কিন্তু তুমি তো কাল থাকবে না।' সহজ কথাটি সহজে বলে ফেলে পাবলো। ঘরে ঢুকে আমি আরো অবাক। কলকাতায় প্রাইভেট কলেজগুলোরও এর চেয়ে ঢের ভালো চেহারা। এ যেন একটা টিউটোরিয়াল হোম!

অবাক হচ্ছো? না? এরকম কলেজ আগে দ্যাখনি বোধহয়? অন্তর্যামীর ভঙ্গিতে বলে ওঠে পাবলো, পকেট থেকে চাবি বের করে নিজের অফিসের দরজা খুলতে খুলতে ঃ 'একটা অ্যাটিক ভাড়া নিয়ে কলেজটা শুরু হয়। একটা চিলেকুঠুরিতে। এখন তবু তো চিলেকুঠুরি ছেড়ে পুরো বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়েছি। এবার পুরো শহরে ছড়াব। দ্যাখো না কী করি! এ বাড়িটার বিভিন্ন অংশে ক্লাস হয়। অ্যাডমিশন অফিসটা হচ্ছে বেস্‌মেন্টে। দোতলা, তিনতলা আর বেসমেন্ট। একতলাটা দোকানদারদের ভাড়া। নইলে টাকা রোজগার হবে কেমন করে? ওঃ! ম্যানহাটনেও অট্টালিকা কিনে ফেলেছি আমরা। উঁহু, অত ঘাবড়িও না, একেবারে খাঁটি কথা বলছি। ওয়াশিংটন স্কোয়ারের খুব কাছেই, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির খাস পাড়াতেই, আমাদের চমৎকার নিজস্ব প্রাসাদ আছে। এগোচ্ছি, ম্যাডাম, এগোচ্ছি। মার্কিন এস্টাবলিশমেন্ট অনুযায়ী সবই হবে আস্তে আস্তে। অর্থাভাব এখন আর প্রায় নেই আমাদের। অভাব কর্মীর।'

একটা চেয়ার ঠেলে দেয় আমার দিকে পাবলো। ছোট্ট ঘরটার এদিক-ওদিকে কয়েকটা চেয়ার ছড়ানো। একপাশে একটা বেশ বড় টেবিল। তাতে টেলিফোন। কিছু কাগজপত্র। কাঁচের দেওয়ালের বাইরে হলে অবশ্য দু'একজন সেক্রেটারি গোছের মেয়ে ডেস্কে বসে আছে। টাইপরাইটার সামনে নিয়ে, গল্প গুজব করছে। আপাতত তারা কথা বন্ধ করে অবাক চোখে আমাকে দেখায় মনোনিবেশ করল।

'অনেক ডোনেশন পেয়েছি। আরও পাচ্ছি। সাত-আট জন ছাত্র নিয়ে কলেজ শুরু হয়েছিল, এখন দুশোর বেশি ছাত্র-ছাত্রী। প্রত্যেককেই অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। লোন স্কলারশিপ, বুকগ্রান্ট ফেলোশিপ, অ্যাসিস্টান্টশিপ– সবরকমই আছে।'

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাবলো টেবিলের কাগজপত্র ঘাঁটছে, চিঠিপত্র খুলছে, আর চতুর্দিকে 'হ্যালো' ছুঁড়ে দিচ্ছে ঃ

'হাই, কার্লোস! হাই গীতা! হাই হুয়ান! হাই লীনা! হেল্লো নীতা!'

আমি আর থাকতে পারি না।

'নীতা? নীতাও আছে?'

'তোমাদের এখানে এত ভারতীয় নামের ছড়াছড়ি কেন?'

'দেখতেই পাচ্ছি মেয়েগুলি ভারতীয় নয়। অথচ শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট ভারতীয় নাম।'

পাবলো প্রশ্নটাই বুঝতে পারে না।

'তার মানে? ভারতীয় নাম আবার কোথায় পেলে?'

'এই যে গীতা, লীনা, নীতা, সবাই তো বাঙালী মেয়ের নাম। সবই খুব চেনা আমার।'

হো-হো করে হেসে উঠে পাবলো। বলে ঃ

'বাঃ বেশ মজাতো? বাঙালী মেয়েদের এরকম স্প্যানিশ নাম থাকে নাকি? এগুলো সবই তো স্প্যানিশ ডাক

নাম।'

'গীতার পুরো নাম ওল্‌গীতা, ওল্‌গার আদুরে সংস্করণ। লীনার নাম মালীনা, নীতার নাম হুয়ানীতা। .... হাই, রিনা!'

'রিনাও!' এবারে হাততালি বাজিয়ে ফেলি।

পাবলো বলে, 'ইরিনা! ইরিনার ডাক নাম।'

আমি মনে মনে বলি, 'ভাল মজা! ছেলেদের নাম কি তবে বুড়ো, বাচ্চু, খোকা, বাবুল?'

পাশাপাশি তিনটে দরজায় তিনটে প্লাষ্টিকের নেমপ্লেট। মির্না গনজালেস, পাবলো গিয়েন, আর ডক্টর এস সেন গুপ্ত!

'সেনগুপ্ত? এও কি তোমাদের স্প্যানিশ ডাক নাম নাকি?'

পাবলো অট্টহেসে ওঠে। 'না-না, ওই তো, ওর কথা বললুম না তখন? আমাদের ভারতীয় সহকর্মী। ইংরাজী বিভাগের চার্জে। এটাই তার অফিস। মির্না, সেনগুপ্ত এসেছে? এখনও আসেনি? আসবে এইবার। মিটিং আছে। এই হলো মির্না, দেখে নাও, খাস পুয়ের্তোরিকার মেয়ে। ওখানেই এম এ করে এখন কলাম্বিয়ায় পিএইচডি করতে এসেছে। ওর স্বামীও পিএইচডি করেছে, কর্নেলে।'

মির্না হেসে নড করে। কী মিষ্টি মুখখানা, শ্যামলা শ্রীময়ী। বড় বড় হরিণ চোখ ঘেঁষে গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুল ঘাড়ে লুটোচ্ছে। ওই হাল্কা প্রিন্টেড ফ্রকের চেয়ে টাঙ্গাইল শাড়িতেই ওকে বেশি মানাতো। নিজের ঘরে ডেস্কে বসে খাতা দেখছিল। দরজা খুলে রেখে অফিসে বসাটা এ দেশে বড় একটা দেখা যায় না। এটা বোঝাই যাচ্ছে, গরম দেশের অভ্যেস!

'তুমি কী পড়াও, মির্না?'

'আমার বিষয় মনস্তত্ত্ব!' বলেই মিষ্টি হাসল মির্না। গালে টোল পড়ল।

'তুমি কি এখানেই থাকো?'

'না, ওর দেশ কলকাতা। নোবোনীটা একজন ভারতীয় কবি।'

পাবলো সগৌরবে আমার পরিচয় দেয়। আমার নামটা যে কতরকম বিশ্রীভাবেই উচ্চারণ করা যায়! 'পিকাসোর কাছ থেকে অতি কষ্টে ধরে এনেছি। কালই কলকাতায় চলে যাচ্ছে!'

'তাই নাকি? সেই কলকাতা থেকে এসেছ এগজিবিশন দেখতে? কেমন দেখলে পাবলোর নেম সেক-এর ছবি? পাবলো তো হপ্তায় হপ্তায় ছুটছে পাগলের মত।'

'সত্যি! শেষই করা যায়নি। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা!'

'আরে এটা তো হবেই! খাস ইস্পানী ঐতিহ্য বাপু! হুঁ হুঁ, মার্কিনীর মত হালকা নয়।' পাবলো ফোড়ন কাটে ঃ 'আমাদের কবি গেল কোথায়? হুয়ান? আমাদের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হুয়ান কিন্তু ভাল কবিও। স্প্যানিশে কবিতা লেখে এবং অতুলনীয় কুস্তি করে।'

'কী?' আমার অবাক হওয়ার ধরনে মির্না-পাবলো দুজনেই খুব জোরে হেসে ওঠে ঃ 'কেন, কুস্তিগীরের কবিতা লেখা বারণ? কবিতা লেখা মানেই তো এক রকমের কুস্তি করা। ভাষার সঙ্গে কুস্তি!'

'হুয়ান! হুয়ান? এদিকে এসো।'

একটি ছেলে প্রায় দৌড়ে চলে আসে। এরও পোশাক-আশাক নেহাত ক্যাজুয়াল। পরনে সাদা গেঞ্জি, তাতে স্প্যানিশ ভাষায় কী সব লেখা নীল-নীল হরফে। গেঞ্জির তলায় মাংসপেশীর দাপট ফুটে বেরুচ্ছে। শালপ্রাংশু নয়, কিন্তু বৃষস্কন্ধ মহাভূজ বটে। দেহ প্রকাণ্ড, মুখটি নেহাত কচি। বয়স আন্দাজ করা শক্ত।

‘এই যে আমাদের ক্যাম্পাস পোয়েট, চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর এবং মহান সবজি-বিক্রেতা, ব্রুকলীনের গৌরব শ্রীমান হুয়ান কার্লোস। আমাদের প্রিয় ছাত্র। ভারতীয় কবি, নোবোনীটা সেন।’

লাজুক হেসে, অল্প ‘বাও’ করে হুয়ান ‘হাই’ বলল। তারপরই স্প্যানিশে গুজ-গুজ করে কী যেন মন্তব্য করল মির্নার কাছে। মির্না আর পাবলো হেসে-হেসে বেশ উপভোগ করল সেই মন্তব্য। আমার খুব রাগ হল। কী অসভ্যতা! কারুর নামে অন্য ভাষায় তার সামনেই মন্তব্য করে, আবার হাসাহাসি করছে! সাধে আর আমরা তৃতীয় বিশ্ববাসীরা ‘অপরিণত’ এই নামে অভিহিত হই! কস্মিন্‌কালেও রাগ পুষে রাখার স্বভাব নয় আমার। তাই রেগে-মেগে বলেই ফেলি ঃ

‘যে ভাষাটা আমি জানি না, রসিকতাটা কি সেই ভাষায় করা উচিত হল?’

‘রসিকতা?’ মির্না বড়-বড় চোখে অবাক হয় ঃ

‘রসিকতা নয় তো এটা, অন্য কথা। কবি ঠিক কবির যোগ্য মন্তব্যই করেছে। কই আমরাও তো এটা বলতে পারতুম? পাবলো, তুমি শিল্পী হয়েও হেরে গেলে।’

‘আমারও আসলে মনে হয়েছিল ঠিক এই কথাটাই।’ পাবলো নির্বিবাদে মেনে নেয় ঃ ‘হুয়ান বলে ফেলেছে। তাই ও ক্রেডিট পাচ্ছে।’

‘ব্যাপারটা কি? আমি যে কিছুই বুঝছি না? কী বলাবলি করছ তোমরা? কিসের ক্রেডিট?’

‘বল না, হুয়ান, বলে দাও না।’ বলতে বলতে পাবলো নিজেই বলে দেয়, ‘হুয়ান বলছে তোমার নাম যে রেখেছে, সে ভুল রেখেছে। নো-বোনিটা নয়, শুধু বোনিটা হলে ঠিক হত। স্প্যানিসে বোনিটা মানে সুন্দরী। সেটাকে নেগেটিভ করে নাম দেয়া ঠিক হয়নি। আমিও তাই বলি।’

হায়রে ভাগ্যচক্র! শাড়ি পরে ব্রুকলিনে এসে আমিও নাকি সুন্দরী! ভাগ্যিস ঢাকার কুট্টিরা কথাটা শুনতে পায়নি! তাহলে ঠিক বলতো, ঘোড়ায় হাসবো! কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্ব আর না-দিতে, মুখে বলি ঃ ‘সর্বনাশ! জানো আমার নাম কে দিয়েছেন? তিনি ত্রিকালজ্ঞ মহাকবি, রবীন্দ্রনাথ ‘টাগোরে’, বুঝেছ? মৃত্যুর পূর্বে এটাই তাঁর মহত্তম কীর্তি।’ ‘তাগোরে? তুমি তাঁকে চিনতে?’ পাবলো, মির্না, হুয়ানের গলার স্বরে বিস্ময়ের ঘূর্ণি উঠে যায়।

‘আমি আর চিনব কেমন করে, তিনি আমাকে চিনতেন।’

‘কিন্তু তিনি তো বহুদিন আগে মারা গেছেন ....।’ হুয়ান অস্পষ্ট বিস্ময়ে বলে।

‘আমিও ততদিন জন্মে গেছি। সেও তো বহুদিন হলো।’

‘তা, হুয়ান, তুমিও কি মির্নার মতন পুয়ের্তোরিকোতে জন্মেছো?’ তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেষ্টা করি, কেননা এই অনেককাল আগে জন্মানোর বিষয়টি একদম আমার পছন্দ হয় না।

‘না, না, এই তো এই ব্রুকলিনে। আমার বাবার এ পাড়ায় ত্রিশ বছরের সবজির ব্যবসা। আজন্ম এই পাড়ারই ছেলে আমি।’

‘তাহলে তুমি স্প্যানিশে কবিতা লেখ কেমন করে? এখানে ভাষা তো ইংরিজি।’

‘কেন, বাবা-মা বাড়িতে তো স্প্যানিশই বলেন? কাকা-মামারা পুয়ের্তোরিকো থেকে আসেন, চিঠিপত্র আসে স্প্যানিশে। তাছাড়া আমিও মাঝে বেশ কিছুদিন পুয়ের্তোরিকোয় ছিলাম। এপাড়ার রাস্তায় ছেলেরা খেলতে খেলতেও স্প্যানিশ বলে। ছোট থেকেই দুটো ভাষা শিখে ফেলি আমরা।’

মির্না যোগ দিল, ‘এপাড়াটাই দ্বিভাষী পাড়া। মার্কিনী এথ্‌নিক গ্রুপগুলো ইদানীং খুবই আত্মসচেতন সাংস্কৃতিক শিকড়-সচেতন হয়ে উঠেছে। আগে যেমন চেষ্টা ছিল মূলের সংস্কৃতি মুছে ফেলে পুরোপুরি সংখ্যাগুরু সংস্কৃতি অর্থাৎ হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট চেহারা ধারণ করবার, এখন সেটা আর নেই।’

‘তবে নিউইয়র্কে চিরটাকালই এথ্‌নিক গ্রুপগুলো আত্মসচেতন হয়ে ঘেটো বানিয়ে থেকেছে। এতেই বল-ভরসা

পাই আমরা, সংখ্যালঘুরা। দল বেঁধে থাকলে, নিজের মূল সংস্কৃতির পরিচয়টা আঁকড়ে থাকলে অন্তত নিজেদের কাছে নিজেরা মূল্যবান হয়ে ওঠা যায়, বহিঃসমাজে যতই অবহেলা পাই না কেন।' পাবলো বেশ জোর দিয়ে বলে, 'তাছাড়া আমাদের ইস্পানীদের কথাটা আলাদা। স্প্যানিশ ঐতিহ্যই তো মার্কিনী মাটিতে প্রথম ইউরোপীয় সংস্কৃতি। তাই না? এই হঠাৎ নবাব অ্যাংলো-স্যাক্সন সভ্যতার আর ক'দিন বয়স এ দেশে? আমরা এসেছি সেই কবে! ইংল্যাণ্ডের গরিব-দুঃখীদের নিয়ে 'মেফ্লাওয়ার' জাহাজ এসে স্পেনের কুলে ভিড়বার বহুদিন আগে। 'আমেরিকা' নামটাই দ্যাখ না? ওটা কি ইংরিজি ঐতিহ্য থেকে পাওয়া? আমেরিগো ভেসপুচ্চি কি হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রোটেস্টান্ট ছিলেন? মার্কিনীদের এই রোয়াব সত্যি আমার সহ্য হয় না। ইস্পানী ঐতিহ্য কত পুরনো, কত মহৎ! আমরা এসেছিলাম ব্যবসা করতে, রাজত্ব করতে। খেতে না পেয়ে উদ্বাস্তু হতে নয়। ইংরেজদের মতো।'

আমি তো অবাক হয়ে পাবলোর বক্তৃতা শুনছি। সত্যই আগে এভাবে ভাবিনি। 'পুয়ের্তোরিকো কি মার্কিনী কলোনি?' ভয়ে-ভয়ে মির্নাকে প্রশ্ন করি, 'সত্যি বলতে কি আমি কিন্তু ঠিক জানি না, ঠাহরও পাচ্ছি না, পুয়ের্তোরিকোর সঙ্গে মার্কিনীদের এই অর্থনৈতিক যোগাযোগটা কিসের?'

'নামে ঠিক কলোনি আর নেই। আগে ছিল। তবে কাজে এখনও তাই বটে। পুয়ের্তোরিকো কি আজকের? মার্কিন দেশ গড়ে ওঠার ঢের আগে থেকেই পুয়ের্তোরিকোর অস্তিত্ব।'

'জানো, চৌদ্দশো বিরানব্বইতে কলম্বাস আমাদের দ্বীপে নেমেছিলেন? তখন সেখানে আরাওয়াক ইন্ডিয়ানরা বসবাস করত। আর দ্বীপের নাম ছিল বরিনকুয়েন বা বরিকুয়া।' মির্নার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাবলোই বলতে শুরু করে দিয়েছে। বাপরে, কে ওকে থামাবে?

'ষোলো শতাব্দীতে ইস্পানীরা এ দ্বীপ দখল করে নেয়। বরিনকুয়েন নাম বদলে হয়ে যায় পোর্টোরিকো। দ্য রিচ পোর্ট। স্বর্ণবন্দর। ক্রমশ সেটাই পুয়ের্তোরিকো হয়েছে। বিপুল পৃথিবী-জোড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল আমাদের। মানে পুয়ের্তোরিকোর। জানো তো, আমাদের কেমন উর্বরা শস্য শ্যামলা দেশ? স্পেনের লোকেরা স্বপ্ন দেখতো পুয়ের্তোরিকোয় এসে ভাগ্য ফেরানোর। হায় রে! ভাগ্য ফেরানোই বটে। যথার্থ কলোনিয়াল নিয়মমাফিক, স্থানীয় আদিবাসী আরাওয়াক ইন্ডিয়ানদের খতম করে ফেলে, তাদের দেশ দখল করে নিলুম আমরা। তারপর জাহাজ-জাহাজ কাফ্রি ক্রীতদাস আমদানি করলুম খেত-খামারে মজুরি করানোর জন্যে। ফলে আমরা পুয়ের্তোরিকানরা খানিক ইস্পানী, খানিক আরাওয়াক ইন্ডিয়ান, আরও খানিক কাফ্রি রক্তে গড়া।'

চটপট এখানে মির্না যোগ করে– 'খানিক মার্কিনীও বটে।' আঠারোশো আটানব্বইতে স্প্যানিশ আমেরিকান যুদ্ধে হেরে গিয়ে মার্কিনীদের কিছু রাজ্য ভেট দেওয়া হয় প্যারিস চুক্তিতে। তার মধ্যে এই আমরাও পড়েছি। পুয়ের্তোরিকো সেই থেকেই আমেরিকার সম্পত্তি। এখন কেবল শোষিত হবার জন্যেই যেন দ্বীপটা বেঁচে-বর্তে আছে আর কি।'

'সত্যি বলতে কি মির্নার মত আমরা ঠিক খাঁটি পুয়ের্তোরিকানও তো নই।' এবার হুয়ান বলে। 'মনে প্রাণে পুয়ের্তোরিকান বটে, কিন্তু জন্মসূত্রে তো মার্কিনীই– অথচ এরাও আমাদের মার্কিনী ভাবে না, আমরাও নিজেদের মার্কিনী ভাবি না। চিরকালটা এখানে কাটিয়ে, এখানে জন্মে, এখানে বেঁচে, এখানেই মরব– অথচ নামে থাকব পুয়ের্তোরিকান আমেরিকান। মির্নার মত ভাগ্য আমাদের তো হয়নি। আমরা স্বদেশে ভূমিষ্ঠ হইনি। এই ব্রুকলিনই আমাদের জন্মভূমি।'

'তুমি তো তবু ঠাকুর্দার কল্যাণে দেশ ঘুরে এসেছ হুয়ান।' পাবলো বলে, 'কিন্তু আমি তো দুর্ভাগা। কখনও দেশেই যেতে পারিনি। তেমন কেউ নেই সেখানে, যাব কার কাছে?' তাড়াতাড়ি মির্না বলে, 'তাতে কী হয়েছে? এবার একবার নিশ্চয়ই দেশে যাবে। নেক্সট সামারেই চলে যাও। আমরা আছি।'

'দেশ! যারা জীবনে কখনো সে দেশে পা দেয়নি তারাও ওটাকে স্বদেশ মনে করছে। যে দেশ তোমাকে ধারণ করেছে, লালন-পালন করছে, সে তোমার দেশ নয়? এ কেমন কথা? জন্মভূমিকে জননী মনে কর না তোমরা? এ হলো প্রবাসভূমি– ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিত থাকা। চতুর্দিকে স্প্যানিশ পোস্টার লটকানো, স্প্যানিশ বিজ্ঞাপনে সব দেওয়াল ঢাকা, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে তার দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা স্প্যানিশ ভাষায় পিজবোর্ডের হোর্ডিং। পাবলো, হুয়ানের ইংরেজিতে মির্নার মতো লাতিন টানও নেই। অথচ ওরা কেমন নিঃসঙ্কোচে বলছে,

'স্প্যানিশই আমাদের মাতৃভাষা .....।' আর আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা? স্বদেশে বসেই কাঁচা কাঁচা ইংরিজি ভাষায় ন্যাকা ন্যাকা কবিতা লেখে, ভাঙা ভাঙা বাংলায় আধো-আধো বুলি কপচায় আর ট্যাঁশ ইস্কুলে গিয়ে ইংরিজিকে ফার্স্ট ল্যাংগুয়েজ করে পরীক্ষা দেয়। আর এদের দ্যাখো, প্রবাসী হয়েও কেমন স্বদেশ-অন্ত প্রাণ?

'তোমরা কী করে এমন স্প্যানিশ ভক্ত রইলে ভেবে অবাক হচ্ছি।'

'মাতৃভূমির অহঙ্কার এমনই আশ্চর্য জিনিস।' মির্না বলে, 'এরা কেউ মাতৃভাষার গর্ব ছাড়েনি। অথচ এ দেশে সেটা ঝেড়ে ফেলতে পারলেই কার্যত সবদিক থেকে উন্নতি হত। চাকরির সুবিধা, ভাল পাড়ায় বাড়ি পেতে সুবিধা, ছেলেপুলের জন্যে ভাল ইস্কুল, ভাল সঙ্গী-সাথী, পরিচ্ছন্নতা।'

'খেলার সবুজ মাঠ। বসন্তের বাতাস। গাছ। ফুল।' আমি মনে মনে যোগ করি।

'শিক্ষিত ইস্পানীরা বড়লোক হয়ে গেলে, উচ্চ মধ্যবিত্ত প্রফেশনে ঢুকে পড়লে, অনেকেই কিন্তু ব্রুকলিন ছেড়ে দেয়। গরিব পাড়ার মায়া কাটিয়ে ব্রংক্সে, পার্কচেস্টার অঞ্চলে উঠে যাওয়ার ঝোঁক হয়েছে আজকাল।'

'ওটাই মনে হয় এবার ধনশালী পুয়ের্তোরিকানদের পল্লী হয়ে উঠবে?'

'অনেকেই কিন্তু যাচ্ছেও না।' পাবলো অনেকটা আপন মনেই আপত্তি করে, 'সেধেই এই গরিব পাড়ায় আমি কিন্তু থেকে যেতেও দেখেছি অনেককে। এটা কী কম? ভালয়-মন্দয়, রক্তের মধ্যে এ-পাড়ার ইস্পানী জীবন ছন্দ জড়িয়ে আছে। ছেড়ে যেতেও প্রাণ চায় না।'

'এ অঞ্চলে তোমরাই বুঝি প্রথম বাস করতে শুরু করেছিলে?'

'প্রথম? নাঃ। প্রথম–প্রথম এটা ওলন্দাজ পাড়া ছিল। আগে এখানে দু-তিনটে ধনী ওলন্দাজ গ্রাম ছিল। ফ্ল্যাটবুশ, ব্রোয়ক্লেহেন। যা থেকে ব্রুকলিন নাম। কিন্তু এখন তো ওলন্দাজরা এ-পাড়ায় আর থাকেই না। তবে বর্তমান বাসিন্দা শুধু আমরাই নই, চীনে দেখছ না? ব্ল্যাক দেখছ না? এটা তো গরিব পাড়া, বিচিত্র মিশ্র ধরনের সংখ্যালঘুদের সমাবেশ হয় এখানে।' ছেলে মানুষ হলেও হুয়ান দেখলুম নিজের পাড়া নিয়ে অনেক খবর রাখে। কুস্তিগীর কবি, সাধারণ ব্যক্তি সে নয়।

– 'হুয়ান তুমি কী ধরনের কবিতা লেখ? প্রেমের? রাজনীতির? দর্শনের? প্রকৃতির?'

'হুয়ান লেখে জীবনের কবিতা।' হুয়ানের হয়ে পাবলোই উত্তর দেয়, 'কিছু রাজনীতি, কিছু প্রেম। ব্যাস। প্রকৃতি-টকৃতি নেই। থাকবে কোথা থেকে? এ পাড়ায় তো শীত গ্রীষ্ম এই দুই মাত্র ঋতু। বসন্ত হেমন্ত যে কী বস্তু চিনিই না আমরা।'

সত্যি! এ পাড়াটায় কোন গাছ নেই। বাড়িগুলোতেও বাগান নেই। কলকাতা এখন কৃষ্ণচূড়ায় ভরা। জারুল গাছে ফুলের রাশ। রাস্তায় বেল, জুঁই, রজনীগন্ধার পসরা। কোনো পার্কও চোখে পড়ল না। বাচ্চারা সব পিচের রাস্তায় খেলছে। তবে বাচ্চাদের খেলার জন্যে পার্ক নিশ্চয়ই আছে, মিউনিসিপ্যালিটির তৈরি। নিয়মিত দূরত্বে। ছাইরঙের ধানকলের মতো দেখতে, আপাদমস্তক সিমেন্ট বাঁধানো চত্বর। দোলনা আর ঢেঁকি লাগানো। পাইপের তৈরি গাছ বসানো। জেলখানার মতো নিরানন্দ। এইসব দরিদ্র পাড়ার দায়সারা পার্কে গাছপালা নেই। গাছপালাওয়ালা সবুজ পার্ক ধনী পাড়ার শোভা ও সম্পত্তি। সুতরাং বসন্ত এবং হেমন্ত শুধু ধনীদের জন্যই বাঁধা।

'ওই যে, দ্যাখো, ওই টেনেমেন্টস– ওখানেই আমরা থাকি।' হুয়ান ঘোষণা করল, 'আমাদের অবশ্য আলাদা টয়লেট আর কিচেনওলা অ্যাপার্টমেন্ট আছে– কিন্তু ওখানে বেশির ভাগেরই জোটে ভাগের কলঘর। আর শোবার ঘরেই রান্নাবান্না।' আমাদের হতবাক দেখে পাবলো বললো, 'এসব পাড়ার দারিদ্র্য তোমরা কল্পনা করতেও পারবে না। আমাদের হুয়ান তো বেশ অবস্থাপন্ন। কিছু ছাত্র আছে, তারা রাত্রে ঘরের মেঝেতে কাগজ বিছিয়ে শোয়। অনেকগুলো করে খবরের কাগজ, আর ওই যে দোকানে শাক-সবজি, ফলটলের কাগজের কার্টনগুলো আসে। সেই পিচবোর্ডের বাক্সগুলো ওরা কুড়িয়ে নেয়। ভেঙে, ভাঁজ করে, মেঝেয় পেতে, সপরিবারে ঘুমিয়ে থাকে ওরই ওপরে। খাট বল খাট, বিছানা বল বিছানা। সবই ওই বাক্স আর খবরের কাগজ। ভাবতে পারো? এই নিউইয়র্কে?'

ভাবতে সত্যিই পারি না।

'শীতকালে? এখানে তো প্রচণ্ড শীত। শীতকালে ওরা কী করে?' হুয়ান অদ্ভুত করে হাসল।

'আগুন জ্বালে, অনেক সময় মরেও যায়। কালো চামড়াওয়ালারা তো মার্কিন জাতি। ওদের নানা অধিকার আছে। আমরা তাও নই। আধা বিদেশী। না ঘরকা না ঘাটকা। যেমন আমাদের রাজনীতির অবস্থা, কংগ্রেসে প্রতিনিধি আছেন। কিন্তু প্রতীকী অস্তিত্ব মাত্র। কেননা, তাঁর ভোট নেই। অথচ আমরা ভিয়েতনামে না গেলেই কিন্তু জেল!' 'এখানে প্রতি স্কোয়ার ফুটের হিসাবে গোটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি স্কোয়ার ফুটের মত লোকজন বাস করে, তার চেয়ে বেশি মানুষের বসবাস। সত্যি করে বল, এই আমেরিকাকে কি তুমি জানতে?'

পাবলোর মুখের কথা কেড়ে নেয় মির্না, 'এবং সেই মানুষগুলো সব অকেজো। তাদের কোনো কাজকর্ম নেই। এখানে যে এত ভায়োলেন্স, তার প্রধান কারণটাই হলো অ্যাডাল্ট পুরুষ মানুষের বেকারত্ব। নেই কাজ তো খই ভাজ, লেগে পড়ে ক্রাইমের লাইনে। অলস পুরুষের পৌরুষ দেখানোর সুযোগ হয় না বলেই তারা হিংস্র জন্তুর মতো হয়ে ওঠে।'

'জন্তু কেন? এ সমস্যাটা একান্তই মানবিক!' পাবলো চেঁচিয়ে ওঠে, 'আলস্যই বল বা কর্মহীনতা, কিংবা অপরাধ এসব কেবলই মানুষের সম্পত্তি। কদাচ জন্তুদের সমস্যা নয়, মির্না! আসলে কি জানো, কোনটা, এই অঞ্চলের মূল সমস্যা কেবল একটাই– দারিদ্র্য। তার থেকেই বাকি সবগুলোর উৎপত্তি– এই এত রোগ, এই বুদ্ধিহীনতা।'

মির্না মাঝখান থেকে বলে, 'জানো তো বোনিটা, অত্যন্ত লো আইকিউ আমাদের এই পাড়ার গরিব ছেলে-মেয়েদের। বাবা-মায়ের অশিক্ষার বুদ্ধির চর্চার অভাবই সেজন্য অনেকটা দায়ী। মনোবিজ্ঞান অন্তত তাই বলছে।' মির্নার কথায় কান না দিয়ে পাবলো পুরনো কথার খেই ধরে বলে, 'এই যে মাতলামি, এই অপরাধ-প্রবণতা, খুন-খারাপি কি চুরি-ছিনতাই, ডোপ পেডলিং আর পিম্পগিরি, আর বেশ্যাবৃত্তি, এ পাড়াটা এমন কেন বলো তো? হার্লেমেও দেখবে এই জিনিস। সবাই অযত্নে ভেঙে ফেলা বিনষ্ট জীবনের বিষফল। আমি অন্তত মনে করি না যে, এই দুর্দশার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে এই হতভাগাদের। দায়ী তো গোটা শহর, দায়ী গোটা আমেরিকার শোষক সমাজ।'

'কিন্তু ঠিক এইরকম সমস্যা তো কলকাতাতেও আছে পাবলো। এটা কেবলই একা তোমাদের নয়। গরিব পুয়ের্তোরিকানদের জীবনযাত্রা এই ধনী সমাজের মধ্যে অবশ্য, খুবই অস্বাভাবিক ঠেকে, সত্যি কথাই। কিন্তু মানুষের এই দুর্দশার দৃশ্য আমার শহর কলকাতায় নিতান্তই স্বাভাবিক। একবার কলকাতায় যেও, আমিও তোমাদের দেখাব আপন দেশ-ভূঁয়ে বসে, স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকদেরও জীবনে অবিকল এমনিই অমানুষিক যন্ত্রণা। আমাদের বস্তি, ঝোপড়ি, ফুটপাত– সেখানকার বাসিন্দাদের জীবন– ওঃ! যদি সে দৈন্যের মুখ কোনদিনও তোমরা দেখতে! শিশুর মুখে দু'বেলাই খাদ্য নেই, তোমরা এমন কখনো এখানে দেখেছো? রাস্তায় কুষ্ঠরোগী অষ্টাদশ শতকের পরে আর দেখেনি ইউরোপ। তোমাদের তো শেয়ার করার মতোও টয়লেট আছে, আমাদের ঝোপড়িতে তাও নেই। আমাদের গরিবদের শহরেও যে কষ্ট, গ্রামেও তাই। সর্বত্রই এই অবস্থা! দারিদ্র্যের ওপরে আবার উপরি যন্ত্রণা আছে, অস্পৃশ্যতা আছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পণ প্রথা, নারী নির্যাতন। ভেব না কেবল মার্কিন দেশেই যত রাজ্যের সামাজিক রোগ, আমরাও ঠিক অতটাই খারাপ বুঝলে পাবলো, এনশেন্ট কালচার হলে কী হবে, আমরা নিজেদের পায়ের তলার মাটিও চিনি না। রঙের কথা বল? আমাদের ঘরের কালো মেয়ের বিয়ে হয় না, জান? অনেক টাকার ঘুষ লাগে অর্থাৎ 'ডাউরি'– অথচ আমরাই সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে সাদা-কালোর বিভেদ নিয়ে লড়াই করি। বিলেতে বসে গলা ফুলিয়ে অ্যাপারথেইড নিয়ে মেজাজ দেখিয়ে বলি ঃ 'সাউথ আফ্রিকা নিপাত যাক।' 'কিংবা রোডেশিয়ার আম খাব না'– আরো কত কি। বড্ডই দ্বৈত মূল্যবোধের রোগে ভুগছি আমরা সবাই। জগৎশুদ্ধ শিক্ষিত মানুষরা সবাই একই নৌকোয় ডুবতে বসেছি।'

'অমন ডুবলে তো চলবে না।' পাবলো মাথা নাড়ে, আর নিশ্চিত গলায় বলে, 'ভেসে উঠতেই হবে, আমাদের টেনে তুলতে হবে ডুবন্তদের। সাঁতার শেখাতে হবে।' ঝলমলে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে পাবলো বলল, 'মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, বোনিটা।'

মির্না আর হুয়ানের মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টি পাবলোর মুখে। ওদের চোখেও যেন আলোর ঝলক এসে পড়েছে পাবলোর থেকে। স্পষ্টতই ওরা স্বপ্ন দেখছে। পাবলো ওদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। এই কলেজটা তাহলে আসলে স্বপ্ন দেখতে শেখানোর কলেজ। ছাত্র-শিক্ষক মিলেমিশে এরা এক নতুন জীবনের, নতুন জগতের স্বপ্ন দেখে– যার গোড়াপত্তন পুয়ের্তোরিকোয়।

আমারই কেবল কী যেন হয়েছে। এই দেশ, এখানকার আলো, আকাশ সব আমার কেমন ধাতব মনে হয়। এই বিলেত-আমেরিকান দামী ধুলোহীন যে পেট্রলমাখা ধোঁয়ার গন্ধ, দোকানে যে সিনথেটিক কাপড়ের থানের গন্ধ, রেস্তোরাঁয় যে মদ্য-মাংসের আয়েশি গন্ধ– এত বছর বাদেও সব কিছুই আমার কেমন অবাস্তব লাগে। এখানকার ঐশ্বর্যও যেহেতু আমার অবাস্তব মনে হয়, এখানকার দৈন্যও কি তাই আমার কাছে যথার্থ মূল্য পাচ্ছে না?

ট্রেতে তিন কাপ কফি, আর এক প্লেট কুকি নিয়ে ঘরে এল গীতা, ওলগীতা। ছোট ছোট কাপে চমৎকার কালো কফি, টার্কিশ কফির ধরনের। শুনেছি কফি জিনিসটা নাকি এশিয়া থেকেই টার্কি, গ্রীস, স্পেন হয়ে ইউরোপীয় সভ্যতায় ঠাঁই করে নিয়েছিল। এখন তো ব্রেজিলেই তার সবচেয়ে বোলবোলাও। কফি দেখে সকলের মেজাজ শরীফ হয়ে গেল। 'হুয়ান? হুয়ানের কফি কই?' পাবলো চেঁচায়, 'গীতা!' 'হুয়ান তো এক্ষুনি চা খাচ্ছিল। আবার এক্ষুনি কফি কি খাবে?' গীতার ধমক আসে বাইরে থেকে চেঁচিয়ে। একে তো এমন চেঁচামেচি অ্যাংলোস্যাক্সন সভ্যতায় মোটে মানানসই নয়। তায় এর যে দেখি বাঙালী দিদির মতন স্বাস্থ্য চিন্তা, স্নেহের শাসন! অবাক হয়ে যাই। নাঃ, এদের সংস্কৃতির ধাঁচই আলাদা। অ্যাংলোস্যাক্সন সমাজের মূল্যবোধ একেবারে অন্য। ঢের বেশি আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো। নাগরিক বিচ্ছিন্নতাবোধের চিহ্ন তাতে। এটা যেন পল্লী সমাজ। লতায়-পাতায় পরিবারতুল্য একটা উষ্ণ গ্রাম্য যোগাযোগ। আবেগভরে প্রশ্ন করে বসি, 'তোমাদের এখানে পারিবারিক বন্ধন খুব গভীর হয়, না?'

ঠোঁট উল্টে কোরাসে উত্তর দেয় পাবলো আর মির্না– 'কোথায় গভীর? প্রচণ্ড বিচ্ছিন্নতাবোধে না ভুগলে কখনো এত অপরাধ-প্রবণতা আসে?'

'তবে হ্যাঁ, সুস্থ অবস্থায়, স্বভূমিতে লাতিন আমেরিকান সমাজে পারিবারিক গ্রন্থি সত্যি সুদৃঢ়–'

'কিন্তু এই শহরে তো আমাদের সমাজটা সুস্থ নয়, এতে আমাদের যথার্থ প্রতিচ্ছবি পাবে না। এখানে যত গরিব, অসার্থক, ব্যর্থ বাপদেরকে ছেলেরা মোটে মানুষ বলেই মনে করে না। তারা 'অক্ষম' পুরুষ। নামকা-ওয়াস্তে বাবা। তাদের প্রতি যুবক পুত্রদের অসীম ঘৃণা।'

'কেউ কেউ বুড়ো বাবাদের তবু একটু ক্ষ্যামা-ঘেন্না করুণা-টরুণা করে, আর কারুর দেখি কেবলই রাগ, প্রচণ্ড বিদ্বেষ... বাপের ওপরে।'

–'বাপের ব্যর্থতার জন্যই ছেলেরও জীবনটা নষ্ট–এমন একটা ধারণায় ভোগে এসব ছেলেরা। বেশির ভাগ ক্রাইম, ভায়োলেন্সের মূলেও ওই জন্মগত ক্ষোভ।'

'আরে বাবা, বাপের ওপর চটবে কী, বাপ থাকলে তো? কোনো বাবাই থাকে না আদ্ধেক পরিবারের! মেয়েরা এ সমাজে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার শিকার। কি মানসিক, কি অর্থনৈতিক, শান্তি বলে, স্বস্তি বলে কিছুই থাকে না তাদের। পুরুষ অভিভাবকরা স্ত্রীদের প্রায়ই শিশুসমেত পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। ব্ল্যাকদের মধ্যে অবশ্য এই সমস্যা বোধহয় আরও প্রবল। এই কারণেও পিতাদের ওপর দায়িত্বহীনতার জন্য কিশোর ছেলেদের প্রচন্ড রাগ।' মির্নার গলায় রাগ ঝলসে ওঠে– 'অথচ বড় হয়ে তারাই আবার প্রেমিকাদের, শিশুদের ত্যাগ করে পালায়। সেই পিতৃপদাঙ্কই আবার অনুসরণ করে। যে কাজকে ঘৃণা করেছে, ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করে। এদিকে আমাদের তো ধর্মে ডিভোর্সও হয় না। এখানে সবাই ধর্ম-ভীরু ক্যাথলিক তো।'

'বড় জটিল, বড় করুণ, আমাদের এই নবীন বোরিকুয়া, বোনিটা। বড় দুর্ভাগা।' পাবলোকে দুঃখী দেখায়।

দু-এক মুহূর্তের স্তব্ধতাও যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে বুকে চেপে বসে। এত কলকল করে একসঙ্গে কথা বলে এরা সবাই। হঠাৎ থামলেই মনে হয় যেন নায়াগ্রা প্রপাত থমকে দাঁড়িয়েছে। গমগম করে ওঠে নৈঃশব্দ। সেই স্তব্ধতা ভাঙতেই বোধহয় হাল্কা সুরে কথা বলে ওঠে মির্না।

‘কফি যখন তুমি খাচ্ছ না, কবিতা তো শোনাও একটা? হুয়ান? তোমার লেখা একটা কবিতা পড়ো না, বোনিটার জন্যে।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ কবিতা পড়া হোক।’ পাবলো এক মিনিটেই আবার খোশ মেজাজ।– ‘দারুণ বলেছো মির্না। বোনিটা তোমার কোনো কবিতা আছে নাকি সঙ্গে? ওই বিশাল থলিতে?’

‘আমি তো লিখি বাংলায়। সেও আবার সঙ্গে নেই। বাক্সসুদ্ধ হারিয়ে গেছে লন্ডনে। হুয়ানই পড় ক।’

‘আমিও তো লিখি স্প্যানিশে। তুমি বুঝবে না।’ হুয়ান বলে সলজ্জভাবে।

‘হুয়ান, একটি কবিতা শোনাও দিখি বোনিটাকে!’ পাবলো মিলিটারি সুরে হুকুম করে। ‘তোমার সেই ‘বরিনকুয়েন’ কবিতাটা? ঠিক বুঝবে।’

‘একটু একটু অন্তত বুঝব, ফ্রেঞ্চ তো বুঝি, তাই।’

‘সঙ্গে তো নেই এখন।’

‘একটাও নেই?’

‘একটাও নেই।’

‘দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এস না, বাড়ি থেকে? এই তো বাড়ি। যাবে, আর আসবে।’

‘তার চেয়ে তুমিই শোনাও না মির্না, তোমার নাটকটা? এখানেই আছে তো–হুয়ান মির্নার দিকে চেয়ে বলে। ‘জানো, মির্না দারুণ একটা নাটক লিখেছে, সেটা পাড়ার সাহিত্য সভায় পড়া হবে আটাশে। পথে-পথে পোস্টার পড়েছে। দেখতে পাওনি?’

‘তুমি নাটক লেখো? মির্না? আর এতক্ষণ আমাকে বলোনি?’ শ্যামলা গাল দুটো টুকটুকে হয়ে যায়– মির্না আপত্তি করে– ‘কই? ওই তো মাত্র একটাই লিখেছি। পুয়ের্তোরিকো আর স্ত্রী স্বাধীনতা এই দুটো কমন বিষয় নিয়ে। ওটা কিছু হয়নি। নাটকই হয়নি ওটা। কেবল পড়বার জন্যে। প্লেরিডিংয়ের জন্য।’

‘দাঁড়াও বোনিটা, পোস্টারটা তোমায় দেখাচ্ছি।’ পাবলো ছুটে বেরিয়ে যায়, কোথায় কে জানে, নিশ্চয় পোস্টার আনতে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি বাবা। লেকচার শুনতে শুনতে কান-প্রাণ গেল। কফি ঠিক শেষ হয়েছে, এমন সময়ে আর একটি বাদামি রঙের ছেলে ঢুকলো। কাঁধে বিরাট চামড়ার কিটব্যাগ। রুক্ষ মাথার চারপাশে সেই ফ্যাশনেবল সাঁইস্টাইল জ্যোতির্বলয়। ঠিক পাবলোর যেমন। মুখভরা ভারিক্কি দাড়িগোঁফ। মোটা কাচের ভারী ফ্রেমের চশমার তলার ঝকঝকে চোখ দুটি স্বতন্ত্র।

দৃষ্টিতে সততা চেনা যায়। মুখখানি কচি, টুলটুল করছে। পরনে জীনস, আর জীনসের জ্যাকেট।

‘বাঃ। এই যে সেনগুপ্ত, এসে গেছো? এই দ্যাখো, তোমার জন্য আমরা কী সংবর্ধনা প্রস্তুত করে রেখেছি। আ পোয়েট ফ্রম ইয়োর হোমল্যান্ড।’ মির্না উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড– নিঃশব্দে, মির্নার কথার কোন উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়েই থাকে ছেলেটা আমার দিকে। খুবই অস্বস্তি হয়। একি রে বাবা? আমি কি মেরিলিন মনরো নাকি? না চার্লি চ্যাপলিন? তারপর একটি নাটকীয় সংলাপ শুনতে পাই– ‘আরেঃ, তুমি নবনীতাদি না? গুড গ্রেশাস। এখানে কী করে এলে? কে তোমাকে আনলো?’

হায় হোরেশিও। কত কিছু আছে দ্যুলোকে ভূলোকে, তুমি কী জানো? এবারে উত্তর না দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার পালা আমার। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি ঃ ‘মীরাদির ছেলে? বাপি না? চুলটা কী করেছে?’ তারপরেই নাটিকা ঘনতর। আহ্লাদের চোটে লাফিয়ে উঠে জাপ্টেই ধরেছি ছেলেটাকে।– ‘টুটুলকে কিছুতেই ফোনে পাচ্ছি না। ওরা সব কেমন আছে রে? জোনাকি কোথায়? তুই কদ্দিন পড়াচ্ছিস?’

‘ভাল। সবাই ভাল। খুব ভাল। টুটুলরা দেশে গেছে, জোনাকি এখনো পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু তুমি কী করে

আমার কলেজে এলে নবনীতাদি?' বজ্র আলিঙ্গন মুক্ত হতে হতে বাপি উত্তর দেয়–'উঃ কী ভয়ানক সারপ্রাইজ। কী আনন্দই যে হচ্ছে তোমাকে দেখে! সিক্সটি নাইনে শেষ দেখা!'

ইতিমধ্যে পাবলো ঘরে ফিরেছে, হাতে এক বাণ্ডিল গোটানো কাগজ। আমাদের অপরূপ মিলন দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ায়। চমৎকৃত হয়ে বলে ওঠে– 'হোয়াট! আর ইউ স্টীলিং মাই লাভলি ফ্রেন্ড? সেনগুপ্ত? দিস ইজ নট ফেয়ার।'

'আমরা যে অনেক পুরনো বন্ধু, পাবলো। উই আর কাজিনস ইন ফ্যাক্ট, মিটিং আফটার আ ডেকেড!'

'রিয়্যালি? ইজ ইট সো? কুড ইট বি ট্রু নোবোনীটা? হোয়াট আ স্মল ওয়ার্ল্ড ইট ইজ! ওয়েল, লাইফ ইজ ফুল অব সারপ্রাইজেস, ডিয়ার সেনগুপ্ত! বাট থ্যাংক মি ফর দ্য রি-ইউনিয়ন।'

'অফকোর্স পাবলো। আর নট ইউ আ মিরাক্লওয়ার্কার?' এরপর প্রবল বাংলা ভাষায় চলল আমাদের কুশল বিনিময়। দশ বছরের জমে থাকা সব গসিপ তো দশ মিনিটে চালাচালি করে নিতে হবে! কলকাতা-দিল্লি-লন্ডন-নিউইয়র্ক-আত্মীয় বন্ধুর সমাজটা তো আর খুব ছোটও নেই! ইতিমধ্যে পাবলো আমার চোখের সামনে বিশাল এক পোস্টার মেলে ধরল। (বোধহয় বাপির দিক থেকে আমার মনটা ওর দিকে সরিয়ে নেবার অসদুদ্দেশ্যও খানিকটা কাজ করছিল তাতে!) নীল-খয়েরি-সাদা-কালোয় ছাপা হলেও পোস্টারটি শিল্প হিসেবে বিশেষ নজর-কাড়ানি নয়। ইংরিজী ও স্প্যানিশ দুই ভাষায় তাতে বড় বড় হরফে লেখা আছে!

'এরিনা পুয়ের্তোরিকো জিন প্রেজেন্টস-ইন বারিনকুয়োন প্লাজা।' তারপর সারিবন্দী কুস্তিগীরদের ফোটোগ্রাফ ছাপানো এবং গোটা চারেক ভবিষ্যৎ কুস্তি প্রদর্শনীর সময়সূচী। দ্রষ্টব্য এই যে সবই প্রদর্শনী খেলা, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ– প্রতিযোগিতা নয়। এই অমানুষিক প্রতিযোগিতার রাজ্যে, প্রতিযোগিতার যুগে, একটা খেলা হচ্ছে যেটা বন্ধুত্বমূলক। হারজিতের বাজী ধরে নয়, কমারশিয়াল নয়– এটা মার্কিন দেশে অবিশ্বাস্য। সব খেলাতেই পয়সা। সব খেলাতেই বাজী ধরা। সব খেলাই জুয়োখেলা। কিন্তু এগুলো সবই যে 'ফ্রেন্ডলি ম্যাচ'-ইংরিজি আর ইস্পানীর সংযোগে এটুকু বেশ বোঝা গেল। এরই একটি ফোটোতে খালি-গায়ে, শর্টস পরিহিত সহাস্য তরুণ কবি হুয়ান কার্লোসকে দেখা যাচ্ছে। রেসলিং চ্যাম্পিয়ন-কাম-কবি জীবনে সত্যিই এই প্রথম দেখছি। আবার শুনছি লেখাপড়াতেও ভালো। তায় আমাকে বলেছে 'বোনিটা'! অলরাউন্ডার আর কাকে বলে? আমি তো মুগ্ধ বিমোহিত। ছাত্রের মতন ছাত্তর বটে! ওটা গুটিয়ে এবারে অন্যটি খুলে দেখালো পাবলো। এটা অনেক ছোট্ট, শুধু সাদা-কালোয় করা শিল্পসম্মত পোস্টার। পুরোনো ফোটোগ্রাফের ঢঙে একটি মেয়ের ছায়াকালো সিলুয়েৎ মুখ আঁকা, আর ইংরিজিতে লেখা– 'দ্য লাতিনো প্লেরাইটস– দ্য মিউজিক অ্যান্ড পোয়েট্রি অফ পুয়ের্তোরিকো, ফ্রম কোলোরেস–টু–ন্যুয়র্ক'– নিয়ে পাঁচটি মেয়ের নাম, তিনটি ইস্পানী, দুটি অ্যাংলো-স্যাক্সন। নাটক পাঠ, কবিতা পাঠ, গান, একদিন গল্প পাঠও আছে পাঁচ দিনের সান্ধ্য প্রোগ্রামে। দুটি নাটকের নাম স্প্যানিশে, তিনটির নাম ইংরিজিতে লেখা। মির্না'র নামও দেখলুম আছে, স্প্যানিশ নাটকের লেখক হিসাবে। সবাই এ পোস্টার পড়বে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে এটা শিক্ষিত দর্শকদের জন্য। আমি লোভে লোভে বলেই ফেলি– 'পোস্টারগুলো আমায় দেবে? আমি পোস্টার জমাই।' পাবলো আর বাপি সমস্বরে বলে ওঠে– 'কত চাই? ক'টা নেবে? কমনরুমে চলো। দেয়ালভর্তি শুধু পোস্টার!' হুয়ান সবিনয়ে সতর্ক করে দেয়– 'তারিখটা পার না হলে কিন্তু ছিঁড়ো না, ছাত্ররা দেখলে গণ্ডগোল করবে। দেখে-শুনে নিও।'

পাবলো অধৈর্য প্রকৃতির শিল্পী মানুষ ঃ

'দূর দূর, অতগুলো আছে, দু-চারটের ডেট না পেরুলেই বা কী? চল, চল, ওপরে চল– কিছু খাবে? দুধ, ফলের রস, সসেজ, বোলোনা, রোস্ট চিকেন, চীজ, রুটি, মধু, মাখন–'

'সব ফ্রী, সব ফ্রী! পয়সা লাগে না। এমন আদর্শ কলেজ জীবনে দেখেছ, নবনীতাদি?' প্রবল উৎসাহে বাপি পাবলোর মুখের কথা শেষ করে দেয়– 'ফ্রী খেয়ে-খেয়ে মোটা ভুড়িদার হয়ে গেলাম সবাই।'

আড়চোখে নিজের দিকে চেয়ে হাসি চাপে। কিন্তু আমার তো মনে মনে অন্যরকম ইচ্ছে-

'পাবলো বলেছিল বাইরে ছোট দোকানে পুয়ের্তোরিকানদের দিশি খাবার খাওয়াবে'–মনে করিয়ে দিতেই পাবলো হৈ হৈ করে ওঠে–'হ্যাঁ হ্যাঁ চল তাই যাই মির্না, তুমিও চল। মিটিংটা আজ ক্যানসেল করে দিই–পরশু

শুক্রবারই হওয়া ভাল। আমরা সবাই মিলে বরং ওই ডমিনিকানদের দোকানে গিয়ে খেয়ে আসি। কী বল?'

'ডমিনিকান খাদ্য তো আর পুয়োর্তোরিকান খাদ্য হল না'– মির্না আপত্তি করে।

'যদিও ডমিনিকানদের রান্নাও খুব ভাল।'

'ভাল মানে? দা-রু-ণ! ডমিনিকানরা যা পাঁঠার মাংস রাঁধে না, উশ্‌শ্‌শ নবনীতাদি, একেবারে দেশের মতন! মসলাপাতি দিয়ে দিব্যি গরগরে করে। আবার হলদে ভাত বলেও একটা জিনিস বানায়, একবারে যেন পোলাও!' বাপি বাংলায় জ্ঞান দেয়। পাবলো মনে করায়–'পরশু সবাই ফ্রী তো? চারটের সময়, এইখানে এই ঘরেই মিটিং। ডন পেদ্রোকে খবরটা দিয়ে দিতে হবে কেবল। সে তো কই এখনও এলই না।' বাপি বলে–'হুয়ান তোমার বাড়ির পাশেই থাকে না ডন পেদ্রো? পরশু আশা করি আসতে পারবে– ছাত্র প্রতিনিধি না থাকতে মিটিং করলে, নানান ঝামেলা। ইচ্ছে করলে ওরা গোলমাল বাধাতে পারবে পরে। হুয়ান, তুমি পেদ্রোকে বলবে এটা খুব জরুরি মিটিং, নিশ্চয়ই যেন আসে। সিদ্ধান্তটা ছাত্র-শিক্ষক উভয় পক্ষে মিলেমিশেই নিতে হবে।' বাপির কথার পিঠে পিঠেই দুষ্টুদুষ্টু হাসির সঙ্গে পাবলো বলে ঃ 'আর বোনিটাকে আমরা বলবো নাকি, ''রেসিডেন্ট পোয়েট অন ক্যাম্পাস'' হ'য়ে এখানে থাকতে? এই মিটিংয়ে পাস করিয়ে নিই প্রস্তাবটা, কি বল হুয়ান? সেও তো খুবই জরুরি সিদ্ধান্ত–'

'দূর দূর! আসবেন কেন নবনীতাদি?' বাপি বাগড়া দেয়–'উনি তো দেশেই পড়াচ্ছেন, টেনিয়র্ড পোস্ট-অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। উনি উঠাৎ ভাল চাকরিটা ছেড়ে কম মাইনেয় চলে আসবেন কেন? সমাজসেবিকা হতে?'

'অ্যাঁ? তুমিও পড়াও? এতক্ষণ তো আমাদের কিছুই বলনি? কী সর্বনেশে মেয়ে তুমি! অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউণ্ডটা শ্রেফ চেপে গেছ? আমরা দিব্যি চাল মারছি–এদিকে সবাই অ্যাসিস্টান্ট প্রফ কি ইন্সস্ট্রাক্টর–একজনও কিন্তু অ্যাসোসিয়েট প্রফ নেই। তুমি কিছু বলছই না। এতক্ষণ আমি ভাবছি সরল ভারতীয় কবিকে বাগে পেয়ে জোর জ্ঞান দিচ্ছি। ছি ছি কী লজ্জা– কী বিষয় তোমার?'

'সত্যিই তো জ্ঞান দিচ্ছ। আমি কিছুই জানতুম না ন্যুয়র্কের এই মিনি-পুয়েৰ্তোরিকোর বিষয়ে। একটা নতুন দেশ- বরিকুয়া'।

'এখনই বা কী জানো?' বাপি ফস করে বলে ফেলে। 'কেবল তো কয়েকজন ছাত্র আরো কয়েকজন মাস্টারকেই দেখেছ। এতে কিছুই জানা হয় না।' 'চল, খেতে খেতেই জানতে পারবে।' পাবলো বলে 'থ্রু ইওর স্টমাক-'

বাইরের 'হলে' একটা গন্ডগোল শোনা গেল এই সময়ে। হঠাৎ কয়েকটি ছেলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকে গড়গড় করে স্প্যানিশে কী সব বলতে থাকে। উত্তেজিত তাদের কণ্ঠস্বর, উত্তেজিত চোখ-মুখ, শরীর কাঁপছে–তাদের পেছু পেছু স্টেনোটাইপিস্ট মেয়ে দুটিও ডেস্ক ছেড়ে ছুটে এসেছে। ওদের বাক্য শেষ হতেই ঘরে একটা পরিপূর্ণ বিবর্ণ স্তব্ধতা নামল। একটাই তো মুহূর্ত। কিন্তু ভয়ংকর সেই নৈঃশব্দ্য।

তারপর পাবলো স্প্যানিশ কথা শুরু করে ছেলেদের সঙ্গে। বাপিও। মির্নাও। গীতাও, লীনাও। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে থাকে। অন্য অন্য ঘর থেকে ছুটে আসছে রিনা, হুয়ানীতা, কার্লোসেরা সবাই। হুয়ান কার্লোস কেবল কথা বলে না। একটা চেয়ারে কেবল চুপ করে বসে পড়ে। বাঃ ইস্পানী ঐতিহ্য দেখছি এক্কেবারে বাঙালী ঐতিহ্যেরই সগোত্র। এরা সবাই বঙ্গসন্তান, কেননা প্রত্যেকে একসঙ্গে কথা বলে। কেউ কারুর কথা শোনে না। হুয়ান, কার্লোসের কি শরীর খারাপ লাগছে? ও দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। একটুও বুঝতে পারছি না– মনে ত হচ্ছে নিউইয়র্কে নেই, আমি পুয়ের্তোরিকোয় বসে আছি। ইস্পানী ঝঞ্ঝার মধ্যে।

'ব্যাপার কি বাপি? কী হয়েছে?'

'খুন'।

'খুন! সে কি!'

‘চমকানোর কিছু নেই। প্রতিমাসেই ঘটছে। ছাত্র খুনের ব্যাপার এ কলেজে ডাল-ভাত!’

‘পলিটিক্যাল মারডার?’

‘নাঃ। গ্যাং ওয়ারফেয়ার- স্ট্রীট গ্যাংদের দাঙ্গা।’ ‘ওয়েস্ট সাইড স্টোরি’ সিনেমাটা দেখেছিলে? দেখনি? দেখলে বুঝতে। মাস্তানদের দলবাজি নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা; স্প্যানিশ ঐতিহ্যের মধ্যে ‘ভেনডেটার’ ব্যাপারটা খুব জবর-দস্ত আছে এখনও। ছেলেগুলো প্রায়ই মরে। মারে, মার খায়, মরে যায়। আশ্চর্য প্রতিহিংসাপরায়ণ, জেদি জাত। মেরে পার পাবে না কেউ। মরতেই হবে। নবনীতাদি, এ ব্যাপারটা চোখে না দেখলে তুমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারবে না−চৌদ্দ থেকে বিশ-বাইশের ছেলেগুলো ফটাফট হরদম মরে যাচ্ছে। এদের প্রাণের কোন গ্যারান্টি নেই। অল্প বয়সেই আন্ডারওয়ার্ল্ডের ছেলে হয়ে যায় সব− শুধু তো গরীব নয়, ওয়াইল্ড, বুনো।

ক্রিমিনাল টেনডেনসির ছেলে এরা; মস্তান, গুন্ডা, ডোপ পেডলার, স্মাগলার, পিম্প, পকেটমার, ছিনতাইবাজ। আমরা এই কলেজে শুধু তো মাস্টারি করি না, প্রধানত সমাজসেবারই একটা প্রয়াস এটা। ওদের জীবনের ধারা পরিবর্তনের চেষ্টা। কিছু মূল্যবোধ গাড়ে তুলে জীবনের মানে করে দেওয়ার চেষ্টা− ওদের চরিত্র সংশোধনেরই প্রোগ্রাম এটা আমাদের। কিন্তু এই দিনকে দিন অকারণ খুন দেখতে দেখতে আমারই বুকের ভেতরটা কেমন যেন পাষাণ হয়ে যাচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে।’ −খুব আস্তে আস্তে বাপি কথা বলছে। ঘরে এখনও স্প্যানিশ ভাষার ঝড়। বাঙালীর কানে ছাত্র খুন নতুন ভাষা নয়। তরুণদের রক্ত আমার শহরেও কম বইতে দেখিনি। কিন্তু সে মৃত্যুতে মহত্ত্ব আছে− ঠিক এ জিনিস নয়। সে প্রাণ ত্যাগ অনর্থক নয়, বন্য পশুর দলাদলি নয়। সে মৃত্যুও মানুষের ইচ্ছার ঘোষণা করে। সে রক্ত কথা কয়। ‘বোনিটা ডিয়ার, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাকে এখুনি একটু থানায় যেতে হচ্ছে। হুয়ান, মির্না, যাবে তো? চল, তবে আমরা যাই- বোনিটা, তোমাকে পুয়ের্তোরিকোয় ভোজ খাওয়াবে বলে ডেকে এনেছিলাম অথচ এভাবে চলে যেতে হচ্ছে এ দুঃখ আমার নিজস্ব। সেন তুমিই বরং বোনিটাকে পুয়ের্তোরিকোর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানাও, তুমি তো যাবে না−যাবে কি-মর্গে?’

‘নাঃ।’

‘সেই ভাল। তুমিই বোনিটার দেখা-শুনা কর, ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিও। ওকে জোর করে পার্টি থেকে ছিনিয়ে এনেছিলুম মিনি পুয়োর্তোরিকো দেখাবো বলে, সে আর হলো না।’

‘ আমি খুবই দুঃখিত, বোনিটা, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ডন পেদ্রো, আমাদের আজকের মিটিঙে যে ছাত্রটির আসার কথা ছিল, সে একটু আগে স্ট্রীটফাইটে মারা গিয়েছে। বডি আইডেনটিফাই করা, বডি খালাস করা, ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে সহায়তা করে সৎকারের ব্যবস্থা করা−এখন অনেক কাজ আমাদের। মানে,-’

‘যাও যাও বেরিয়ে পড় তোমরা, আমার জন্য একটুও ভেবো না। আমি আর বাপি ঠিক আছি। হে ভগবান!’

‘বোনিটার জন্য ভাবতে হবে না, সে এখন থেকে আমার দায়িত্ব, পাবলো-’ বাপি বলে, ‘তোমরা মাথা ঠান্ডা করে বেরিয়ে পড়।’

মুহূর্তে ঘর ফাঁকা।

পুরো বিল্ডিংটাই ফাঁকা।

হঠাৎ কান্নার শব্দে তাকিয়ে দেখি টাইপরাইটারের পাশে টেবিলে মুখ নামিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে গীতা। ওলগীতা। তার মাথায় হাত রেখে মার্লিনা স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। পেটটি উঁচু হয়ে সংবাদ দিচ্ছে আসন্ন শুভ-দিনের।

‘গীতা ডন পেদ্রোকে ডেট করছিল ইদানীং। কে জানে হয়তো সেই জন্যই মরল ছেলেটা। গীতার পুরোনো বয়ফ্রেন্ড ভয়ানক হিংসুটে। এরা কথায় কথায় একেবারে খুন করে ফেলে। রক্ত দর্শন করতে চাওয়া তো মুখের কথা।’

‘চল বাপি, বেরিয়ে পড়ি। এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।’

‘কেন? পড়াতে আসবে না এখানে? পাবলোর নেমন্তন্নে? ক্যাম্পাস-পোয়েট? এতেই কাবু?’

‘ঠাট্টা করছ?’

‘ঠাট্টা নয়। এ এক অদ্ভুত জগৎ নবনীতাদি। একদিন আমিই তো খুন হয়ে যাচ্ছিলুম আর একটু হলেই।’

‘সে কি রে? কার সঙ্গে ডেট করতে গেছলি আবার?’

‘সে সব নয়। ডেট-ফেট-এর ব্যাপারই নয়। তয় একটু আগেই একটা খুন হয়ে গেছে।- আজ খুব টেনশন থাকবে রাস্তায়। দেরি করা উচিত হবে না। নাকি ও-পাড়ায় চলেই যাব আগে? গিয়ে ডিনার খাব? ভাল একটা কোনো দোকানে ঠান্ডা জায়গায় গিয়ে একটু বসবে?’

‘আমার তো এখানেই ইচ্ছে। পুয়ের্তোরিকান পাড়ায় একটু হাঁটব না ? খাবার দোকানগুলো কেমন একটু দেখব না? ভাল দোকানে তো ঢের খেয়েছি।’

‘ তোমার যদি ভয় না করে ঠিক আছে।’

‘ভয়ের সত্যি কিছু আছে কি? আমরা তো কোনো গ্যাং-এই নেই। এসব যুদ্ধ-বিগ্রহে বাইরের লোকের ভয় নেই, যদি না বোমা-টোমা বেমক্কা ফেটে যায়।’

‘নাঃ বোমার তেমন চল নেই, এ অঞ্চলে ফেবারিট হ’ল ছুরি মারা। পিস্তল কেনারও পয়সা নেই কিনা। কিন্তু, সত্যিই তোমার ভয় করছে না? খুন হয়েছে জেনেও এ পাড়ায় খাবে? আশ্চর্য মেয়ে তো?’

‘আশ্চর্য হচ্ছো কেন? কলকাতায় কি খুন হয় না? সেখানেও পাড়ায় পাড়ায় খুন হচ্ছে। বরং আরো বেশি রকম বিপজ্জনক। যখন-তখন বোমা ছুঁড়বে, যাকেতাকে এলোপাতাড়ি মেরে ফেলবে। লক্ষ্য স্থির করতে পারে না কেউ। ট্রামের ভিতরে, বাসের ভেতরে বসেও রক্ষে নেই। পুলিশের গুলি এসে লাগবে, গুন্ডার বোমা এসে লাগবে। শত্রুরা ভিড়ের বাসে উঠে এসে ছুরি মেরে যাবে। কেউ বাধা দেবে না। তুমি জান না বাপি, এপাড়া তো সেই তুলনায় নন্দনকানন। কেউই ছুটে এসে ছোরা মারবে না আমাকে। বড় জোর ব্যাগটা ছিনিয়ে নেবে। সে তো কলকাতাতেও নিচ্ছে হরদম। কিন্তু তুমি কেন খুন হয়ে যাচ্ছিলে বললে না তো?’

‘বলব। চল আগে খেতে বসিগে। আশ্চর্য জাত একটা বটে এরা। কী জানি, হয়তো খাস পুয়ের্তোরিকোতে এরকম নয়। এখানে এসে এত ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক চাপে কষ্ট পেতে পেতে এদের মনগুলো সব অষ্টাবক্র হয়ে যায়। সেই সব ট্যারা-ব্যাঁকা রুগ্ন মনের ছাত্রদের নিয়েই আমার কারবার। মির্না যেমন সাইকোলজিস্ট, তেমনি কলেজের সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, অ্যাডভাইজ করেন, কেরিয়ার কাউনসিলর আছেন– ওদের গড়ে -পিটে নতুন জীবনের সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করি সবাই মিলে। এই জন্যই কলেজটা এ পাড়ায় রেখে দিয়েছি আমরা– ম্যানহাটানে কেনা প্রাসাদ বাড়িতে যাইনি। ‘সাইটে’ থাকাটা জরুরী। পাড়ায় একটা প্রভাব পড়েই শেষ পর্যন্ত...। অন্তত, তাই আমাদের আশা– একদিন প্রভাব পড়বে।’

একটা অত্যন্ত নোংরা ফুটপাত দিয়ে হাঁটছি। সব দোকানেই ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে। রাস্তাটাকে এমনিতেই যুদ্ধক্ষেত্রের মতো দেখায়, এখন আরও দেখাচ্ছে। রাস্তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট জোট বেঁধে দল পাকিয়ে ছেলেরা দাঁড়িয়ে। নেহাত বালক-বালিকা, টলটলায়মান শিশুও অভিভাবকহীন রাস্তায় খেলছে। মানুষের তুলনায় গাড়ির সংখ্যা এখানে সত্যি কম। কেবল ভ্যান, টেম্পো জাতীয় মালবাহী গাড়ি। সত্যি বড্ড গরীব পাড়া। নইলে ন্যুয়র্ক শহরে কেউ এভাবে রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয় চাপা না-পড়ে? হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে এমন চেহারায় ৫/৬-তলা বাড়িগুলির দোরগোড়ায় দল পাকিয়ে গুলতানি করছে ফ্রীস্কুল স্ট্রীটের রিকশায় বসা খুব গরিব অ্যাংলো-মেয়েদের মতো চেহারার গেরস্ত গিন্নিরা। এরা বেশ্যা নয় বলেই মনে হ’ল, খুব সাদাসিধে, সাজসজ্জা নেই একদম। দারিদ্র্য, মালিন্য, রুক্ষতা ও শ্রীহীনতা সর্বশরীরে ফুটে আছে– চুলে চিরুনী পড়ে না। ক্লান্তি আর তিক্ততা যৌবনকে ছাপিয়ে উপছে উঠছে এদের মুখে। ট্যাঁকে কচিকাঁচা। ঠিক দেশের মতন।

মোড়ের একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকান থেকে প্রচন্ড জোরে মাইক্রোফোনে দ্রুতলয়ের স্প্যানিশ গান বাজছে। বন্ধ দোকানের দরজার সামনে দু’টি বালক-বালিকা। বছর বার-তেরর বেশি হবে না। মেয়েটি কিন্তু পুয়ের্তোরিকান নয়। স্পস্টতই ব্ল্যাক। মাথা থেকে গোটা পঁচিশেক কেঁচোর মতো সরু সরু লিকলিকে বিণুনি

ঝুলছে। আর প্রত্যেকটার শেষে তিন-চারটে করে রঙিন পুঁতি গাঁথা! মাথাটা দেখাচ্ছে ঠিক মেডুসার মতো (শত নাগিনীর ফণা যেন চুল হয়ে আছে মাথায়)- কিন্তু মুখে আশ্চর্য একটা ধবধবে হাসি নিয়ে মেয়েটি আপন মনে গানের ছন্দে ছন্দে নেচে যাচ্ছে। ফর্সাটে বাচ্চা ছেলেটা মাথায় মাথায় ওর সমানই হবে। ঠিক আমাদের দেশের ছেলের মতই দেখতে। সেও খুব সুন্দর নাচছে নিজের মতো করে, গানের তালে তালে। দর্শক নেই, কিন্তু নাচিয়েরা মশগুল। আনন্দের প্রতিমূর্তি।

আজই এই রাস্তায় খুন হয়ে গেছে একটু আগে। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।

বাপি কনুই ধরে টানে।-'চলে এসো।'

' কী সুন্দর।'

' কী সরল কৈশোর। নিস্পাপ, নির্ভার।'

'কে বলেছে? সরল? জানলে কী করে, যে ড্রাগ খেয়ে নেই? নাচের ধরন দেখে তো মনে হচ্ছে না ওটা ঠিক স্বাভাবিক। মেয়েটার চোখ দেখছো?'

সত্যিই তো। যেন শিবনেত্র হয়ে আছে! এত সুন্দর নাচ তবে মনের আনন্দে নয়, ড্রাগের ঘোরে?

'ড্রাগ পায় কোথায় অতটুকু বাচ্চা? এদের মা-বাপ নেই?'

'হাসিয়ো না। পায় কোথায় মানে? এরা নিজেরাই হয়তো পেডলার। আর বাপ-মা? থাকা-না থাকায় তফাত নেই। এখানে ওসব কৈশোর-ফৈশোর নেই নবনীতাদি। কেবল মানি অ্যান্ড সেক্স। ছোট্ট বাচ্চাও এটা শিখে যায়। চল চল, দোকানটা এসে গেছে। এখানেই আমরা আগে লাঞ্চ করতুম। কমনরুমটা হবার আগে।'

একটি বিমর্ষ মলিন দরজা ঠেলে বাপি ঢুকলো। অন্ধকার। ভিতরে ছোট ছোট টেবিলে বিমর্ষ মলিন ব্যক্তিরা বসে আছে। একপাশে একটা বার। সেখানে উঁচু টুলের ওপরে আরো কিছু দুঃখী মানুষ দাঁড়ের ময়নার মতো বসে বিয়ার পান করছে। দেওয়ালের রঙ দেখা যাচ্ছে না। ওয়াল পেপারের বদলে (এই রেস্তোরাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এইটে বলেই আমার মনে হলো) দেওয়ালগুলো সব আপাদমস্তক সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও বাদ না দিয়ে, পোস্টারে ছাওয়া। এই পোস্টার পোশাকই দোকানটির মূল শোভা, সজ্জা, সম্পদ। বড় বড় মুখের ছবি–গাইয়ে, বাজিয়ে, ধর্মীয় প্রচারক, মুষ্টিযোদ্ধা, চিত্রতারকা, রাজনীতিক নেতা, কুস্তিগীর, খুনী, প্রবঞ্চক, পলাতক আসামী প্রত্যেকেই সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। নব্বই ভাগ স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। আর কিছু চীনা ভাষায় পোস্টার। ছাপা, হাতে লেখা, স্টেনসিল– সব রকমই আছে। ইংরিজি পোস্টার খুবই কম– নেই বলাই ভালো, যা আছে প্রত্যেকটাই দ্বিভাষী, স্প্যানিশ ভাষার বিজ্ঞপ্তি সমেত। হুয়ানদের কুস্তি টুর্নামেন্টের একাধিক পোস্টার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মির্নাদের কবিতা পাঠের আসরের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল না। হাসি হাসি হুয়ানের অর্ধনগ্ন পেশীবহুল ছবিটা দেখে হঠাৎ তার দু-হাতে মুখ ঢাকা চেয়ারে বসা চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল। ওর বন্ধু ছিল ডন পেদ্রো। চোখ ঘুরতে লাগল ভবিষ্যৎ তারিখওলা পোস্টারের ওপরে। নিকারবোকার স্ট্রীটেনিকারবোকার ডান্সিং পার্টি হচ্ছে, 'আনডার থারটিন নট অ্যালাউড'–লিঙ্কন সেন্টারে ফেস্টিভাল অব হিসপ্যানিক আর্টস হচ্ছে–ব্রুকলিন ওয়াইডব্লুসি- এতে রোলার স্কেটিং প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ব্রুকলিনের জিমখানাতে কুস্তিই শুধু নয়, মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবস্থাপনাও দেখা গেল। স্প্যানিশে লেখা হলে কি হবে, ছবি-টবি দেখে সবই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

'পুয়ের্তোরিকান সংস্কৃতির একটা খতিয়ান নিচ্ছে বুঝি? কী যাবে বল।'

'তুমিই বল বাপি। আমি কি জানি কোনটা ভাল? তাছাড়া মেনুই তো নেই।'

'বেশ। প্রথমে কাঁচকলা ভাজা খাওয়া যাক। তারপরে চিংড়ি মাছের পোলাও। সঙ্গে কী খাবে? বিয়ার চলবে? না কোকাকোলা? আমের রসও অবশ্য খেতে পারো। দাঁড়াও, মেনু এনে দিচ্ছি।'

হৈ চৈ করে বাপি কাকে যেন ডাকলো। এক বৃদ্ধ চীনে এসে দাঁড়াল। হাতে এক টুকরো ছেঁড়াছেঁড়া নোংরা মতন কার্ড। তাতে স্প্যানিশ ভাষাতে মেনু ছাপানো। তার পাশেই কালি দিয়ে হাতে চীনে-জাপানী ধরনের

অক্ষরে কিসব লেখা। কবিতা নাকি? ইংরিজির চিহ্ন নেই মেনুতে। অথচ জায়গাটা নিউইয়র্ক।

'কি সব লেখা এগুলো? কবিতা নাকি? না হিসেব?'

'কবিতা হবে কেন, মেনু! চীনে ভাষায় লেখা। এটা পুয়ের্তোরিকান প্লাস চীনেদের দোকান যে। ভীষণ মিক্স নেবারহুড তো– প্রধানত ল্যাটিন আমেরিকান অর্থাৎ বাদামি হলেও, এখানে কালোও আছে, হলদেও আছে। গরিব পাড়ায় সর্বদাই যা হয়। বেশি গরিবদের, এক রং।–এই দ্বীপেই আবার অন্যদিকে বিরাট একটা ইহুদী পপুলেশন আছে– কথায় বলে না, ব্রুকলিন অ্যাকসেন্ট? ব্রুকলিন কলেজটা আছে, শিক্ষিত পাড়াও আছে, ধনীপাড়াও। ঐ ইহুদী অঞ্চলেই আছে ধনীদের পাড়া। মজার দ্বীপ এই ব্রুকলিন, সত্যি। তবে আমরা এখন যেখানে, সেইটেই সবচেয়ে দুঃখী পাড়া।'

'জাত-বেজাতে গ্যাংওয়ারফেয়ার হয় না? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা?'

'হয় না যে–একেবারেই, তা বলব না। তবে সেটা খুব বেশি নয়। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই মেলামেশা এবং খুনোখুনিটা বেশি চালু।'

'তোমাকে যে মারতে এসেছিল বলছিলে তখন।'

'বলছি। তাহলে কী খাবে? কলাভাজা, চিংড়ির পোলাও, আর আমের রস? ওটাই খাও। কেননা, ওটা সোজা পুয়ের্তোরিকো থেকে আমদানি করা হয়–আমার তো খেতে খুব ভালো লাগে। আর তারপরে! আইসক্রীম আর পুয়ের্তোরিকান কফি? বানান, স্প্লিট্ও খেতে পার।'

'নাঃ মিষ্টান্ন থাক। শুধু কফি।'

'দারুণ বানায় এরা কফিটা–অন্য রকম খেতে।.' বৃদ্ধ চীনেটি অর্ডার নিয়ে চলে গেল। আমাদের মুখে বাংলা শুনে সে বিন্দুমাত্রও অবাক বলে মনে হল না। মুখে ভাবলেশহীন বিবর্ণতা। মনে হয় হঠাৎ ছুরি বার করে আমাকে মেরে দিয়ে প্যান্টে রক্তের হাত মুছে, বিয়ার ঢালতে পারবে অনায়াসে।

'তোমাকে যে একবার ছুরি মেরে দিচ্ছিল বললে।'

'ওঃ! সে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা একটা। সেই প্রথম স্বাদ পেলুম এই পাড়ার চরিত্রের। সদ্য জয়েন করেছি, জীবনে প্রথম মাস্টারি। ভাগ্যিস, টরন্টোতে সেই কমিউনটাতে অতদিন ছিলুম? তাই তবু কিছু কিছু ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, অ্যালকোহলিক, নানান বিচিত্র ফিন্জ পিপ্লদের সঙ্গে চেনা হয়েছিল, হিপি-টিপিদের মুড-মেজাজ ধরন-ধারণ বুঝতে শিখেছিলুম, কিছুটা আইডিয়া ছিল, তাই সেবার রক্ষে পেয়েছি।' বাপি একটা সিগারেট ধরাল।

'একদিন টিউটোরিয়াল পিরিয়ডে, ওই তো আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অফিস কুঠুরি দেখে এলে, দুটো চেয়ার দুদিকে, মাঝখানে একটা টেবিল, দেয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড–দরজা বন্ধ না করলে উল্টোদিকের চেয়ারে কেউ বসতে পারবে না। সেদিন টিউটোরিয়াল পিরিয়ডে, মারকাস রডরিগেথ আমার অফিস ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করেই ঝুঁকে পড়ে টেবিল থেকে আমার ফোনটা তুলে নিয়ে ওপাশে তার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো। আমি অবাক হয়ে ভাবছি ফোনটা সরাচ্ছে কেন, টেবিলে কি কোনো চার্ট বা পোস্টার বিছোবে? ভাবতে না ভাবতেই স্যাঁৎ করে ছুরি বের করে, বোতাম টিপে তার ফলা বের করে ফেলেছেন তিনি।'

'ছুরি? হা ঈশ্বর! কী সর্বনাশ!'

'শোনোই না! সর্বনাশ তো হয়নি, দেখতেই পাচ্ছ।– রডরিগেথ তো ছুরি বের করেছে, সামনে কেবল চওড়া টেবিলটুকুর তফাত। একটু ঝুঁকলেই আমার বুকের নাগাল পাবে সে।'

'কিন্তু কেন ছুরি বের করল? হঠাৎ?'

'ঠিক সেই প্রশ্নই আমি করলুম ওকে। মার্কাস স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। ভয় পেলেই ওরা আরও জোর পেয়ে যায়। থ্রেটটা ইগনোর করলে দুর্বল হয়ে পড়ে। আসলে তো ভিতরে ভিতরে দুর্বলই। মুখটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে, গলায় যথাসাধ্য নির্বিকার ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করে, আপ্রাণ চেষ্টায় ভয় লুকিয়ে সহজভাবে বললুম,

ছুরি কেন, মার্কাস? ব্যাপার কি? হোয়াটস দ্য ম্যাটার?'

'দ্য ম্যাটার ইজ সিম্পল।' রডরিগেথ বলল গম্ভীর মুখে, 'আমি তোমাকে খুন করব আজ। শয়তান! ঈশ্বরকে স্মরণ কর।' থিয়েট্রিকাল সংলাপ। হাসবো না কাঁদবো?

'কিন্তু মার্কাস, কারণটা তো তার আগে বলবে? মরতে আপত্তি নেই, একদিন তো মরবই, জগতে কেই বা অমর? কিন্তু তোমার তো কোনো ক্ষতি করিনি আমি?'

'ক্ষতি করেছ বৈকি। তোমাকে হুবহু আমার শয়তান বাপটার মতন দেখতে। তোমার সামনে বসে থাকতেও আমার ঘৃণা হয়, রোজ তোমার মুখ দর্শন করা আমার পক্ষে অসহ্য জ্বালা। তোমার সঙ্গে হেসে হেসে 'সুপ্রভাত শুভরাত্রি' করা আমার স্নায়ুকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলেছে। তোমাকে আজ আমি শেষ করবো। নইলে আমার মুক্তি নেই।'

'আহা, সত্যি? খুবই বুঝতে পারছি তোমার অবস্থাটা, মার্কাস! কিন্তু আমি তো প্রায় তোমারই সমবয়সী, আমি তো তোমার বাবা হতে পারতুম না? সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, তোমার বাবার সঙ্গে আমার রক্তেরও মিল নেই। তা, তোমার বাবা এখন কোথায়?'

'কী জানি। সে ব্যাটার দশ বছর হল দেখা নেই। তার আগেও কি দেখা ছিল? বছরে দু-একবার চিলের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত, মাকে ধরে পিটাত, আমাদের মেরে শেষ করত, সংসারে আমাদের যা কিছু থাকত সর্বস্ব ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে চলে যেত, ডাকাতটা। প্রত্যেকবার ওর ভয়ে আমরা বাসা বদলাতাম। তবুও ঠিক বের করে ফেলত, ঠিক এসে মেরে-ধরে কেড়ে-কুড়ে নিয়ে যেত আমাদের শীতের পোশাক, গায়ের কম্বল, রান্নার বাসনপত্র, যেখানে যা পেত। বাবার ভয়ে মার কোনো প্রেমিক পর্যন্ত ছিল না। মা আমাদের তিনজনকে একলা, প্রচণ্ড পরিশ্রমে মানুষ করেছেন। বিনা নিরাপত্তায়, বিনা ভালবাসায় অতিরিক্ত খাটুনিতে, বিনা বিশ্রামে, বিনা যত্নে মা এখন আমার রুগ্ন; অকাল বার্ধক্যে শয্যাশায়ী। সর্বদাই কাল্পনিক আতঙ্কে চমকে চমকে ওঠেন-এই বুঝি বাবা এল, কেড়ে-কুড়ে নিয়ে গেল সর্বস্ব। ছোটবেলায় আমাদের পা ধরে ঝুলিয়ে শূন্যে দোলাতে দোলাতে মাকে বাবা বলত-দে সব বের করে, নইলে দেয়ালে ঠুকে মেরেই ফেলব এটাকে! এখন মা দিনের বেলাও সেই দুঃস্বপ্ন দেখেন-মেরো না ওকে, দিচ্ছি দিচ্ছি বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন।'

'তোমরা তিন ভাই-বোন? কত বয়স তোমাদের?'

'ভাই আঠারো, আমি বাইশ। মাঝে বোন। বছর দুয়েক হল বোনটা মারা গেছে। সেই থেকেই মা পাগল। মার ধারণা, বাবাই এসে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। আসলে তা নয়, ওর প্রেমিক ওকে অ্যাবরশন করাতে নিয়ে গিয়েছিল, হাতুড়ে ডাক্তার মেরে ফেলেছে। অদ্ভুত বোকা মেয়ে, পিল খেত না। ধর্মভীরু ছিল।'

'বাবাকে তুমি দশ বছর দ্যাখনি?'

'না। এ পাড়ায় এসেছি আট বছর। তারও বছর দুই আগে শেষবার এসেছিল বাবা।'

'দশ বছরে কত কিছুই তো ঘটে যায় মার্কাস। তোমার জ্যান্ত বোনটা যে বেঁচে থাকলে আজ কুড়ি বছরের হতো, সে মারা গেছে। তোমার পরিশ্রমী মা পাগল হয়ে গেছেন। তোমার হতচ্ছাড়া বাবা কি এখনও বেঁচে আছেন? মনে তো হয় না। তিনি নির্ঘাত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। নইলে দশ বছর একটানা তোমাদের শান্তিতে বাঁচতে দিতেন না। নিশ্চয়ই এসে এসে নিয়মিত অত্যাচার চালিয়ে যেতেন। আমি তোমাকে একেবারে স্থির নিশ্চিত বলছি, মার্কাস, বিশ্বাস করো, তোমার বাবা কখনই বেঁচে নেই। তোমার মা'র উচিত বৈধব্য পালনের ব্যবস্থা করা।'

'মানে? তুমি বলছ বাবা বেঁচে নেই? মরে গেছে?'

'নিশ্চয়ই মারা গেছেন। মাকে তুমি বোঝাও যে, মা ফ্রী, মা মুক্ত। আর ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

'মা ফ্রী?'

'অবশ্যই ফ্রী। বেঁচে সে নেই কক্ষনো। থাকলে এর মধ্যে ঠিক আসতোই। টাকাকড়ি নিতোই। এই তোমারই

মতন আর কোনো ছেলের ছুরির ফলা তাকে খতম করে দিয়েছে সন্দেহ নেই। অত বেশি বজ্জাত লোককে পৃথিবী সহ্য করে না বেশিদিন। ও খুন হয়ে গেছে।'

'মেরে ফেলেছে? খুন করে ফেলেছে? ঠিক। ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ তুমি! বেঁচে থাকলে ও এতদিন ছেড়ে দিত না আমাদের। ঠিক আসত। কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে খুঁজে বের করত। এতদিন কেন কথাটা মনে হয়নি আমাদের? এতদিন কেউ কেন বলে দেয়নি এ কথাটি? আতঙ্কে শিঁটিয়ে থেকে থেকে মা বেচারি পাগল হয় গেলেন। এই বুঝি কেউ এল, দস্যুর মতন! দরজায় কেউ টোকা দিলেই সর্বশরীর কেঁপে উঠত মার। উঃ! ভগবান!'

তারপরেই ছুরিটা আমার টেবিলে ফেলে দিয়ে মার্কাস উঠে দাঁড়াল। 'আমি দুঃখিত, স্যার, খুবই দুঃখিত'— বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'তখন চেয়ার ছেড়ে উঠবার ক্ষমতা নেই আমার। হাত-পা যেন জমে গেছে। ঘামে সর্বশরীর ভিজে জবজব করছে।' বাপি চুপ করল। আমিও চুপ।

'মার্কাস এখন কোথায়, বাপি? খবর রাখ?'

'কলেজেই আছে। এবারে ফাইনাল ইয়ার।'

'ওর মা?'

'পুরোপুরি সারেননি। তবে আগের চেয়ে ভালো। মা-ছেলে, দুজনের জন্যেই সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হয়েছে।'

'ওঃ।'

'ভয় পাচ্ছো, নবনীতাদি? বেঁচে যে আছি, সেই তো ঢের। এই তো, ডন প্রেদ্রোটা আজ আর বেঁচে নেই। কালও আমার ক্লাসে এসেছিল। এই তো জীবন। অনিত্য বলে অনিত্য! ভয় পেয়ে আর কী হবে?'

কলাভাজা আর আমের রস আগেই এসেছিল, এবার চিংড়ির বিরিয়ানি হাজির হল। পরিমাণে প্রচুর। টেবিলে নানা রকমের সসের বাজার বসেছে যেন। চীনে সয়াসস, চীনে চিলিসস, মেক্সিকান টাবাস্কো সস, আমেরিকান টোমাটো কেচাপ, ইংলিশ মাস্টার্ড, ভিনিগার, নুন, মরিচ, কী নেই? পোলাওতেও প্রচুর মসলা। মাঝারি চিংড়ি মাছ ভাজায় ভরা হলুদ ভাত। তাতে লঙ্কাকুচি, পেঁয়াজকুচি, টোমাটো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, দক্ষিণ ফ্রান্সে কামার্গ অঞ্চলে খুব ক্যাস্ট্রিলিয়ান রান্নার প্রভাব, সেখানে একটা বুনো ঘোড়া ধরার র‍্যাঞ্চে গিয়ে একবার ভোজ খেয়েছিলুম— বিরাট বিরাট চ্যাপ্টা লোহার কড়াই এসেছিল চাকাওলা মস্ত ট্রলিতে চেপে, তাতে ছিল এমনি চিংড়ি মাছ দেওয়া তেলতেলে হলুদ ভাতের রাশি, পাপরিকার লাল-সবুজ কুচি মেলানো। কিন্তু দুটোতে কত তফাত। দৃশ্যে, স্বাদে, মূল্যেও নিশ্চয়ই। সেই খাদ্যটার নাম ছিল 'পায়েল্লা'। এও নিশ্চয় তাই।

'জানো বাপি, কেম্ব্রিজে একটা ছোট্ট কন্টিনেন্টাল রেস্তোরাঁ ছিল। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ওখানে লাঞ্চ করতে গিয়ে আমরা ঠিক এই পায়েল্লা পোলাওটা, আর সঙ্গে চীজ ছড়ানো ফ্রেঞ্চ আনিয়ন স্যুপ, তাতে ক্রুতোঁর কুড়মুড়ে কুচি ভাসানো, খেয়ে আসতুম। সস্তায় দারুণ সুখাদ্য! অথচ এখন কেম্ব্রিজে সেই দোকানটাই আর নেই!

'ছাত্রাবস্থার এই দোকানগুলো সবই এভাবে মুছে যায়, তাই না নবনীতাদি?' বেশ নিশ্চিন্ত গলায় বলে বাপি।

এই সময় একটি বাদামি মেয়ে সঙ্গে একটি বছর দু-তিনের ছেলে আর একটি ক'মাসের শিশু নিয়ে ঢুকল। পাশের টেবিলেই এসে বসে চেঁচিয়ে কাকে যেন ডাক পাড়ল। চীনেটি এল। নির্বিকার মুখে অর্ডার নিয়ে গেল। একটু পরেই পাশের টেবিলে থরে থরে সুদৃশ্য খাবার এসে জড় হতে লাগল। ও বাবা, এই তো রোগা-টোগা মতন মেয়েটা, এত খাবার খাবে? প্রথমে বোতলে জল ভরে সে প্র্যামে শোয়া শিশুর মুখে লাগিয়ে দিল। তারপর নিজের পাত থেকে খাদ্য তুলে তুলে পাশের শিশুকে খাওয়াতে লাগলো। বার থেকে একটি বয়স্ক পুরুষ গেলাস

হাতে উঠে এসে মেয়েটির টেবিলে বসে। দুজনে হাসিঠাট্টা করতে লাগল, ফাঁকে ফাঁকে মেয়ে নিজেও খাচ্ছে, ছেলেকেও খাওয়াচ্ছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে গালে টোল ফেলে লাল-টিয়াপাখি ঠোঁটে হাসল। এলো খোঁপাবাঁধা ঘাড়ের ওপরে, কালো লম্বা চুলের, পরনে বড় ঘের-ওলা কালোয় লালে ছাপা স্কার্ট, সবুজ ফুল ফুল যৌবনদর্পিত ব্লাউজ।

'ভারী সুন্দরী না, ওই মেয়েটি?'

'হ্যাঁ, পুয়ের্তোরিকান মেয়েরা বড় লাবণ্যময়ী। অনেকটা বাঙালী-বাঙালী দেখতে হয়।'

'আরে দ্যাখো, দ্যাখো, বাচ্চাটাকে কী সুন্দর নিজের পাত থেকে তুলে খাওয়াচ্ছে? ঠিক আমাদেরই মতন না? মেমসাহেবদের মতন নয়।'

'তা'বলে আমাদের মতনও নয়। ওদের মেয়েদের জাতই আলাদা।

'মেয়েদের আবার জাতিভেদ কর নাকি তোমরা?'

'ভেদ নেই বুঝি? সব এক?'

'কী জানি? থাকতেও পারে। তোমরাই বুঝবে।'

'কেন পুরুষদের জাতিভেদ কর না তোমরা? বাঙালী পুরুষ আর পাঞ্জাবী পুরুষ, ফর এগজাম্পল? আফ্রিকান আর সুইড?'

'তা বোধহয় করি।'

'তবে? এও তেমনি। বাপরে! যা মুশকিলে পড়েছিলুম একবার। অন্তত বাঙালী মা আর পুয়ের্তোরিকান মায়ের জাত যে কত আলাদা, তার প্রমাণ যথেষ্ট পেয়েছি জীবনে। শুনবে? কিছু মনে করবে না তো? একটু ইয়ে মতন ঘটনা কিন্তু! মানে—'

'বল বল, শুনি। ইয়ে মতন আবার কি? আমরা তো এতদিন শুনেছি উলটোটাই—জগতের সব মা একজাত।'

'ঘটনাটা বাবাকেও বলেছি। তাই তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। তবে তুমি তো মেয়ে, যদি শক পাও?'

'পেলে পাব। তুমি বল। ওসব মেয়ে পুরুষ বাজে কথা, আমি তো অ্যাডাল্ট? এত শত ভাবনার কিছু নেই। বলবে তো একটা সত্য ঘটনাই।'

'এই যে ডন পেদ্রোর শব-সংসর্গে আমি গেলুম না, এতে তুমি আমাকে খারাপ ভাবলে না?'

'তা একটু ভেবেছিলুম অবিশ্যি, তারপর ভাবলুম হয়ত আমি এসে পড়ায় গেলে না সৌজন্যবশত।'

'তুমি না এলেও যেতুম না। এমনিই একটি ছাত্রের ফিউনারালে গিয়ে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারপর থেকে আর যাই না। আমার কোলীগরাও জানে, তাই জোর করে না।'

'ঘটনার শুরু এই আজকের মতোই। গিলবের্তো এরনান্দেজ, বয়স উনিশ, সফোমর ক্লাসের ছাত্র, একদিন মরে গেল। স্ট্রীটফাইটিংয়ে। খবর পেয়ে গেলুম আন্ডারটেকারের আফিসে। একটা কিউবিকলে তার শব কফিনে রাখা আছে। ওর টার্ন আসবে। শবদেহের কিউ পড়েছে। ওয়েটিং লিস্টে আছে। ওর কিউবিকলে ঢুকে দেখি একলা একজন রূপসী মহিলা বসে আছেন কফিনের মাথার কাছে। নিবাত নিষ্কম্প। অন্যমনস্ক। চমকে উঠলুম! এত রূপ? সসংকোচে আমার পরিচয় জানাতেই মহিলা একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন, 'আসুন। আসুন, আমি গিলবের্তোর মা, লুডমিলা এরনান্দেজ। আমাকে মিলা বলেই ডাকবেন। আপনাকে দেখিনি বটে কিন্তু গিলবের্তোর কাছে আপনার গল্প অনেক শুনেছি।' যেন এটা তাঁর বাড়ির বৈঠকখানা। মহিলা অত্যন্ত চার্মিং। এমন সহজ, উচ্ছ্বলভাবে কথা বলছেন, যেন সামনে তাঁর পুত্রের মৃতদেহ নেই। কিন্তু আমি সহজ হতে পারছি না কিছুতেই। হুঁ-হুঁ করছি। গিলবের্তোর মা বললেন—'গিলবের্তো আমার শেষ ছেলে। অবশ্য শেষ সন্তান নয়। এখনও বাকি আছে ছোট মেয়ে কার্লা। সে থাকে পুয়ের্তোরিকোতে। আরো আছে অবশ্য একজন। মারিয়া।

গিলবের্তোর এ বছর উনিশ হয়েছিল।'

'কার্লার বয়স কত?'

'পনেরো। তার ঠিক ওপরে হল এদুয়ার্দো– তার সতেরো হত, থাকলে। সে গেছে গত বছরে।' সহজ গলায় বলেন গিলবের্তোর রূপবতী মা।

'গেছে? কী হয়েছিল তার?'

'কে জানে? গিলবের্তোর যা হয়েছিল, তাই। রাস্তায় খতম। আর যদি রোবের্তো বেঁচে থাকত, তার বয়স হত চব্বিশ, এই ডিসেম্বরে। সে গিয়েছে ভিয়েতনামে। হেসে হেসে সুন্দরী লুডমিলা বললেন–সেই আমার প্রথম সন্তান, প্রথম পুত্রও।' দেখে-শুনে আমি তো জিহ্বাহীন শ্রুতিসর্বস্ব জড়বস্তু হয়ে যাচ্ছি। উনি খুব সহজ। একি ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনছি? আর কে তার বক্তা? আর কী তার ভাষা? সুর? অথচ মহিলার এমন অসামান্য রূপ যৌবন, এত প্রচণ্ড শোকের ধাক্কাতেও কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি। দেখলে মনে হবে এই বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স। দিব্যি সহজ গলায় গল্প করছেন পুত্র সন্তানদের মৃত্যুকাহিনী। যেন কার না কার গল্প। 'রোবের্তো আর গিলবের্তোর মধ্যে পাঁচ বছরের তফাত। তাদের মধ্যে আছে মারিয়া। ছোটবেলাতেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম পুয়ের্তোরিকোতে। আমার মায়ের কাছে। ওখানেই ঘর-সংসার করছে সে। মারিয়ার দুটি বাচ্চা। সুখী হয়েছে ও।' এই রূপসী কন্যার আবার নাতি-নাতনীও আছে? যা বাব্বা! আমি তো থ।–'

'ছোট মেয়ে কার্লা বুঝি আপনার কাছেই আছে?'

'থাকতো। এখন আছে স্বামীর কাছে।'

'সে কী? পনেরো বললেন না? এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলেন কী করে? বেআইনি তো। তাছাড়া এত কম বয়সে বাচ্চা-কাচ্চা হলে তো ভীষণ ঝামেলা। মহিলার সহজ স্বাভাবিকতা দেখে আমি হঠাৎ খুব সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেছি। ভুলেই গিয়েছি যে স্থানটা ফিউনারাল হোম। কালটা পুত্রশোকের মুহূর্ত, আর পাত্রী সদ্য পুত্রহারা জননী।'

মহিলা অদ্ভুত এক হাসি হাসলেন।

'প্রেমের কি বয়স আছে? সে যে প্রেমে পড়েছিল।'

'আপনি বাধা দিলেন না?'

'বাধা দিয়ে কী লাভ হতো? বাচ্চা হচ্ছে যখন, তখন বিয়েটা সেরে ফেলাই মঙ্গল নয় কি?'

'বাচ্চা হচ্ছে!'

'আমার প্রেমিকটি খুবই সৎ, দেবতুল্য বলতে হবে। কার্লার মা হবার সম্ভাবনা জানতে পেরে নিজেই চার্চে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে আমার কার্লাকে। আমাকে কিছুই বলতে হয়নি।'

'কার প্রেমিক বললেন?'

'আমার। আমার প্রেমিক। এখন সে অবশ্য আমার জামাই।'

গলার স্বর একটা ফাঁপা প্রতিধ্বনির মতো শোনালো। এক্ষুনি যেন একটা দীর্ঘ টানেলের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলে গেছে। তার গুমগুম শব্দ ভেসে আছে বুকের মধ্যে। ভদ্রমহিলা হঠাৎ বিদ্যুতের মতো আমার গলা জড়িয়ে ধরে কোলে এসে বসলেন। গলার স্বরে জ্যামজেলি ঝালমিষ্টি আমের আচার মাখিয়ে বললেন– 'আচ্ছা, তুমিই বলো তো প্রফ, আমি কি সুন্দরী নই? ভালো করে দ্যাখো তো প্রফেসর'– বলতে বলতে নিজের গা থেকে জামাটা খুলে ফেললেন– আমার চোখে যেন সাদা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো। চোখ ধাঁধিয়ে গেল– আমার হাতটা ধরে নিজের দেহে রাখলেন লুডমিলা। আমি কী যে করি? ওকে তো কোল থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারি না? সামনে শুয়ে আছে কফিনের বিছানায় মৃত গিলবের্তো। তাড়াতাড়ি বললুম–'আপনি খুবই সুন্দর, ম্যাডাম, কিন্তু আমরা এখানে একা নই। প্লীজ গেট ড্রেসড। আই বেগ ইউ।'– 'কেন? গিলবের্তোর কথা বলছ? গিলবের্তো এতে কিছু

মনে করবে না। সে খুশিই হবে। প্লীজ, এসো না, আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি। প্লীজ, প্রফ, লেটস মেক লাভ? শ্যাল উই?'

'আমাকে মাপ করুন মিসেস এরনান্দেজ, এটা যে একটা পাবলিক প্লেস!'

'কল মি লুডমিলা।'

'ইয়েস, লুডমিলা। প্রেমের উপযুক্ত আব্রু নেই যে এখানে। প্রত্যেক কামরায় মানুষ শব আগলে জেগে রয়েছে—ধরুন কেউ যদি একটা দেশলাই চাইতে এল কিংবা যদি টার্ন হলে আনডারটেকারই এসে পড়েন?' কিন্তু কাকে বলছি? ইতিমধ্যে মহিলা দক্ষ হাতে আমারই বস্ত্রহরণ শুরু করেছেন। অগত্যা আমি মরিয়া, ওকে ঠেলে নামিয়ে জোর করে উঠে পড়ে ফ্লাই বন্ধ করি। কাতর হয়ে বলতে থাকি, 'শুনুন, লুডমিলা, আমি নিশ্চয়ই যাবো, কালই যাবো আপনার কাছে, বাড়িতে অতি অবশ্যই যাবো। আপনি পরমা সুন্দরী, বিশ্বাস করুন, আপনার রূপে দৈব বিভা আছে, মানুষকে পলকহারা করে দেয়, প্লীজ, প্লীজ বিশ্বাস করুন'— ব্যাকুল হাতে আমার বোতাম আঁটছি আর আকুলস্বরে বলছি— 'আপনার প্রেমিক হতে পারলে আমি কৃতার্থ বোধ করব, আমি ধন্য হয়ে যাব— এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না— কিন্তু আজ নয়, এখানে নয়। লুডমিলা শুনুন, এখানে আমি সত্যিই পারবো না। আর শুনুন, যে লোক আপনার মতো সুন্দরীকে পরিত্যাগ করে যেতে পারে সে মানুষ নয়। তার কথা ছেড়ে দিন, সে উন্মাদ, পাগল, সে সুস্থ নয়।'

লুডমিলা স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আবার আমার হাতটা চেপে ধরলেন। আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে বলে উঠি— 'না, না আজ আর নয়, রাত ঢের হল, আমি বাড়ি যাবো এখন, আবার কাল আসব, এখন ছেড়ে দিন। বাড়িতে আমার বাবা-মা অপেক্ষা করছেন।'

হাত ছেড়ে দিয়ে লুডমিলা হঠাৎ উপুড় হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। প্রচণ্ড জোরে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন— 'অপেক্ষা তো আমিও করছি, এল কোথায় তারা? রোবের্তো কি ফিরলো? আমার বীর রোবের্তো? এদুয়ার্দো— কি ফিরলো? আমার ছোট্ট কোলের ছেলেটা? গিলবের্তো ফিরলো, আমার খ্যাপা রাগী ছেলে? অপেক্ষা কি আমিও করিনি? আর কত অপেক্ষা করব? হে যীশু, হে মেরি মা, আর কত অপেক্ষা করব আমি? —বল, বল—বল আমাকে—'

কী করে যে সেই রাতটা কাটিয়েছিলুম না নবনীতাদি— ওই হিষ্টিরিয়া রোগীকে ফেলেও তো চলে আসা যায় না?— সে যে কেমন রাত? আমি এর পরের কথা আর তোমাকে কিছু বলতে পারবো না।

তুমি লেখক, তুমি মানুষের ভিতরটা জানো, তুমি আপনি বুঝে নাও।'

বাপি চুপ করে গেল।

কেউ কোন কথা না বলে খাবারের দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এলুম। মেয়েটিও উঠে বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে আসছে, সঙ্গে বারের সেই লম্বা প্রৌঢ় লোকটিও।

'প্রস্টিট্যুট।' চাপা গলায় বাপির এই কথাটা না জানালেও চলতো। রাস্তায় বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই কীভাবে যেন মেয়েটি পালটে গেছে।

আকাশে সন্ধ্যা লেগেছে। ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে, গায়ে শিরশির করে কাঁটা দিল। কেঁপে উঠছি দেখে বাপি তাড়াতাড়ি বললো, 'আমার জ্যাকেটটা দিচ্ছি, গায়ে ঢাকা দিয়ে নাও।'

আমি আপত্তি করি।— 'শীতে নয় বাপি, শীত করছে না। গায়ে হঠাৎই কাঁটা দিল দেখছি। কে জানে কেন?'

এ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? অতিকায় কোন লৌহপিঞ্জরের মধ্যে? বিপুল, দীর্ঘ লোহার থামের অরণ্য আমার চারদিকে, মাথার ওপরে রডের দাঁড়ি টানা টানা ছাদ— পায়ের তলায় ছ'লেনের বড় রাস্তা। হেডলাইট জ্বেলে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে নৌকোর মতন গড়নের সব মার্কিন গাড়ি। দূরে চেনা যাচ্ছে ম্যানহাটানের দাম্ভিক আকাশস্পর্শী আলো। নদীর ওপারে আবছা ব্রুকলিন ব্রীজ। নদীতে অনেক স্টীমার, তাদের আলো, আশপাশে ম্লান জীর্ণ ঘরবাড়ি, নির্জীব নিয়নবাতি আর ম্রীয়মাণ, মূহ্যমান, মলিন মানুষের ক্লান্ত হাঁটা-

চলা। যান্ত্রিক পায়ে দু'জনে স্টেশনের দিকে চলেছি। বাপি নিস্তব্ধ। আমি কিছু বলতে চাইলুম—একটা দোকানের মাথায় জ্বলছে তীব্র বেগুনি সবুজ নিওন বাতিতে 'বরিকুয়া'— মানে পুয়েের্তোরিকো—মানে ধনের বন্দর—স্বর্ণবন্দর বরিকুয়া—'বাপি, শোনো,' আমি বলতে শুরু করলুম। ঠিক তক্ষুনি মাথার ওপর দিয়ে বাজ পড়ার মতো শব্দ করে একটা দীর্ঘ ট্রেন ছুটে যেতে লাগল অন্তহীন কাল ধরে।—আমি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি নিজের ফুসফুসের বাতাসে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করি কিন্তু বলে উঠি— 'যদি তোমাদের কলেজে সত্যিই চাকরি খালি থাকে—', আমার মুখের কথাগুলো বাপির কাছে গিয়ে পৌঁছাল না। অনেকক্ষণ ধরে বাতাসের সঙ্গে প্রবল যান্ত্রিক কলহ আমার পল্‌কা কথাগুলোকে ঘর্ষমাণ চাকার তলায় চাপা দিতে দিতে ছেৎরে-মেৎরে রক্তাক্ত করে ছিটিয়ে ফেলে দিল, সেই আধো অন্ধকারে, সেই ঝুরো বৃষ্টির সন্ধ্যায়, স্বর্ণবন্দরের সেই দ্বীপান্তরী দারিদ্র্যের নিরাকার বে-আব্রুর মধ্যে।